المنهج لمريد العمرة والحج

উমরাহ ও হজে গমনিচ্ছুকদের পথনির্দেশিকা

মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন

শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন রচিত ‘উমরাহ ও হজে গমনিচ্ছুকদের পথনির্দেশিকা’ নামক গ্রন্থটি হজ ও উমরাহ আদায়ে আগ্রহী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা। এই গ্রন্থটিতে কুরআনুল কারিম ও সুন্নাহর আলোকে সফরের আদব, ইহরামের বিধান, হজ ও উমরাকারীর ওয়াজিবসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছে।

এছাড়াও এতে হজের নির্ধারিত মীকাত, হজের প্রকারভেদ, মুসাফিরের সালাতের বিধান প্রভৃতি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

সাথে হজ ও উমরার প্রতিটি রুকন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত পদ্ধতির আলোকে কীভাবে সঠিকভাবে আদায় করতে হবে, তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

উমরাহ ও হজে গমনিচ্ছুকদের পথনির্দেশিকা

লেখক: সম্মানিত শাইখ আল্লামা

মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন

আল্লাহ তা'আলা তাকে, তার পিতামাতা এবং মুসলিমদেরকে ক্ষমা করুন।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ইস্তেগফার ও তাওবা করি। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নফসের অনিষ্টসমূহ এবং আমাদের কর্মের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ তাআলা যাকে হেদায়াত দেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তার ওপর, তার পরিবার ও সকল সাহাবীর ওপর এবং কিয়ামত অবধি যারা ইহসানের সঙ্গে তাদের অনুসরণ করবে তাদের সবার ওপর অসংখ্য সালাত ও সালাম নাযিল করুন। অতঃপর:

নিশ্চয় হজ সর্বোত্তম ইবাদত ও সর্বশ্রেষ্ঠ আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এটি ইসলামের স্তম্ভসমূহের একটি, যা দিয়ে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং যা ছাড়া বান্দার দ্বীন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

আর যেহেতু কোন ইবাদত দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব নয় ও তা তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না এই দুটি শর্ত ছাড়া:

এক: আল্লাহর প্রতি এখলাস বা একনিষ্ঠতা; অর্থাৎ ইবাদত দ্বারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকাল

উদ্দেশ্য করবে, তাতে কোন লৌকিকতা ও সুনামের উদ্দেশ্য থাকবে না।

দুই: কথা ও কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই আনুগত্য অর্জন সম্ভব নয়, তার সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ছাড়া। তাই যে ব্যক্তি নবীর অনুসরণ করতে চায়, তার জন্য আবশ্যক হল, তার সুন্নাহর শিক্ষা গ্রহণ করা– অর্থাৎ আহলে ইলম (জ্ঞানী ব্যক্তিদের) কাছ থেকে তা গ্রহণ করা, হয় লিখিতভাবে অথবা সরাসরি গ্রহণের মাধ্যমে। আর আলেমদের কর্তব্য হল- যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকারী ও উম্মতের মাঝে তার প্রতিনিধি– তারা নিজেদের ইবাদত, আখলাক ও লেনদেনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত যা তারা শিখেছেন তা বাস্তবায়ন করা এবং উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও তাদেরকে এদিকে দাওয়াত দেওয়া। যেন জ্ঞান, আমল, تبليغ (বার্তা পৌঁছানো) ও دعوة (দাওয়াত)-এর দিক থেকে তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃত উত্তরাধিকার অর্জিত হয় এবং এর মাধ্যমে যেন তারা সেসব সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্য্য ধারণের ওসিয়ত করেছে।

এটি হজ ও উমরার বিধানের সারসংক্ষেপ, যাতে আমি আমার জানা কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের

আলোকে বর্ণনা দিয়েছি। আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, তিনি এটিকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে কবুল করবেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিবেন।

লেখক

***

সফরের আদবসমূহ

যে ব্যক্তি হজ বা অন্য কোনো ইবাদতের উদ্দেশ্যে বের হয়, তার জন্য উচিত, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের নিয়ত মনে উপস্থিত রাখা; যেন তার কথা, কাজ ও ব্যয় সবকিছুই তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তীকারী হয়। কেননা

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[1].

"আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল রয়েছে।"[1]

আর তার উচিত উত্তম চরিত্র ধারণ করা যেমন: উদারতা, ক্ষমাশীলতা, সাহসিকতা, সাথীদের প্রতি প্রাঞ্জলতা প্রকাশ করা, তাদেরকে সম্পদ ও শারীরিকভাবে সহায়তা করা এবং তাদের মাঝে আনন্দ

---

[1] সহীহ বুখারী: ওহীর সূচনা সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কীভাবে ওহীর সূচনা হয়েছিল, হাদীস নং(১); এবং সহীহ মুসলিম: নেতৃত্ব সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী: "নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল", এবং এতে জিহাদ ও অন্যান্য কাজ অন্তর্ভুক্ত—হাদীস নং (১৯০৭); উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

প্রবেশ করানো। এছাড়াও, তার ওপর আল্লাহ যে ইবাদতগুলো ফরয করেছেন তা পালন করা এবং হারামকৃত বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা।

তার উচিত খরচ ও সফরের সামগ্রী বেশি করে সঙ্গে নেওয়া, এবং এ ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সাথে নেওয়া; ভবিষ্যতে তার বিভিন্ন প্রয়োজন দেখা দিতে পার সে বিষয়ে সতর্কতা স্বরূপ।

তার উচিত সফরের সময় এবং সফরে থাকাকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দোয়াগুলো পাঠ করা। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১- যখন সে নিজের পা তার বাহনে রাখবে, তখন সে বলবে: "বিসমিল্লাহ"। অতঃপর যখন সে বাহনে স্থিরভাবে বসবে, তখন সে যেন আল্লাহ বান্দাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের বাহন সহজ করার মাধ্যমে যে নিয়ামত দান করেছেন, তার কথা স্মরণ করে। তারপর সে বলবে:

«اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، ﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقۡرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ،»[2].

উচ্চারণ: "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওমা কুন্না লাহু মুকরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হাযা আল বিররা ওয়াত তাকওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মা তারযা।

আল্লাহুম্মা হাওবিন 'আলাইনা সাফারানা হাযা, ওয়াতবি 'আন্না বু'দাহু। আল্লাহুম্মা আনতাস সহিবু ফিস সাফারি, ওয়াল খলীফাতু ফিল আহল। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ওয়া'সায়িস সাফারি, ওয়া কা'আবাতিল মানযারি, ওয়া সূইল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহল।"

অর্থ: "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, পবিত্র তিনি যিনি এটিকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, অথচ আমরা কখনও এটিকে অধীন করতে পারতাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের রবের (প্রতিপালকের) কাছে ফিরে যাব। হে আল্লাহ, আমরা আমাদের এই সফরে আপনার কাছে কল্যাণ, তাকওয়া এবং আপনার সন্তুষ্টিমূলক আমল প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দিন এবং আমাদের জন্য এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ, আপনি সফরের সঙ্গী এবং পরিবারে উত্তরসূরী। হে আল্লাহ, আমি সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং সম্পদ ও পরিবারে খারাপ পরিণতি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[1]

---

[1] সহীহ মুসলিম: হজ পর্ব, অধ্যায়: হজ বা অন্যান্য সফরে আরোহনের সময় কী বলবে, হাদীস নং (১৩৪২); ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

২- উচু স্থানে উঠার সময় তাকবীর বলা এবং নিচু স্থানে নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলা।[1]

৩- কোন স্থানে অবতরণ করলে বলবে:

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»[4].

উচ্চারণ: "আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক।"

অর্থ: "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর মাধ্যমে তাঁর সৃষ্ট সব কিছুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।"[2] কেননা যে ব্যক্তি এই দোয়াটি পাঠ করবে, কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না; যতক্ষণ না সে যে স্থানে দোয়াটি পাঠ করেছে সেখান থেকে প্রস্থান করে।

***

নারীর সফর

নারীর জন্য হজ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নয়, যদি তার সঙ্গে কোনো মাহরাম না থাকে; সফরটি দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত, তার সঙ্গে অন্যান্য নারী থাকুক বা না থাকুক, সে তরুণী হোক বা

---

[1] সহীহ বুখারী: জিহাদ ও ভ্রমণ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: যখন উপত্যকায় নামা হয় তখন তাসবীহ বলা, হাদীস নং (২৯৯৩); জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

[2] সহীহ মুসলিম: যিকির, দোয়া, তওবা ও ইসতিগফার বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: খারাপ তাকদীর ও দুর্ভাগ্য স্পর্শ করা ইত্যাদি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, হাদীস নং (২৭০৮); খাওলা বিনতে হাকীম রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত হাদীস।

বৃদ্ধা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ব্যাপক অর্থবোধক বাণীর কারণে:

«لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»[5].

"কোন নারী মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সাথে সফর করবে না।"[1]

নারীদেরকে মাহরাম ছাড়া সফর করতে নিষেধ করার হিকমত হল: নারীর বুদ্ধির অপূর্ণতা এবং নিজের প্রতিরক্ষায় ঘাটতি। সে পুরুষদের আকর্ষণের বস্তু, ফলে তাকে হয়তো ধোঁকা দেওয়া হতে পারে অথবা তাকে জোরপূর্বক বাধ্য করা হতে পারে। অথবা সে দ্বীনের দিক থেকে দুর্বল হতে পারে, ফলে সে নিজের প্রবৃত্তির পেছনে ধাবিত হয়ে পড়তে পারে এবং সে লোভীদের লালসার শিকার হতে পারে। আর মাহরাম সাথে থাকলে, সে তাকে রক্ষা করবে, তার মান-ইজ্জত হেফাযত করবে এবং তার পক্ষে প্রতিরোধ করবে। এ কারণেই মাহরামের সাবালক এবং বুদ্ধিমান হওয়া শর্ত। তাই এমন ছোট শিশু, যে বালেগ হয়নি, কিংবা যার বুদ্ধি নেই সে মাহরাম হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

মাহরাম হলেন মহিলার স্বামী এবং সেই সব ব্যক্তি যাদের সঙ্গে রক্তসম্পর্ক, দুধের সম্পর্ক বা বৈবাহিক

---

[1] সহীহ বুখারী: শিকারের প্রতিদান বিষয় পর্ব, অধ্যায়: নারীদের হজ, হাদীস নং (১৮৬২); এবং সহীহ মুসলিম: হজ পর্ব, অধ্যায়: নারীদের মাহরামসহ হজ বা অন্য সফরে যাত্রা করা, হাদীস নং (১৩৪১); ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

সম্পর্কের কারণে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম। রক্তসম্পর্কের মাহরাম সাতজন:

১- পিতা ও পিতামহগণ, এভাবে উপরের দিকে যত উঠুক— হোক তা মাতার দিক থেকে অথবা পিতার দিক থেকে।

২- পুত্র, পুত্রের পুত্র এবং কন্যার পুত্র, এভাবে যত নিচে যাক।

৩- ভাইয়েরা, হোক তারা সহোদর ভাই, বা বৈপিত্রেয় ভাই বা বৈমাত্রেয় ভাই।

৪- ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, হোক তারা সহোদর ভাই, বা বৈপিত্রেয় ভাই বা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র।

৫- ভাগিনাগণ, হোক তার সহোদর বোন, বৈপিত্রেয় বোন বা বৈমাত্রেয় বোনের ছেলে।

৬- চাচাগণ, হোক তারা সহোদর চাচা, বৈপিত্রেয় চাচা বা বৈমাত্রেয় চাচা।

৭- মামাগণ, হোক তারা সহোদর মামা, বৈপিত্রেয় মামা বা বৈমাত্রেয় মামা।

দুধ সম্পর্কের মাহরামগণ রক্ত সম্পর্কীয় মাহরামদের মতোই; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[6].

"বংশীয় কারণে যারা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও তারা হারাম হয়।"[1]

---

[1] সহীহ বুখারী: সাক্ষ্যসমূহ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: বংশগত সম্পর্ক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া, হাদীস নং (২৬৪৫); এবং সহীহ মুসলিম: দুধ সম্পর্ক

বৈবাহিক সূত্রে মাহরামগণ হলেন:

১- নারীর স্বামীর পুত্রগণ, এবং তার পুত্রদের পুত্রগণ, এবং কন্যাদের পুত্রগণ — এভাবে যত নিচের পর্যায়ের হোক (অর্থাৎ পরবর্তী বংশধর হলেও); তারা আগের স্ত্রী থেকে হোক, অথবা বর্তমান স্ত্রী থেকে, অথবা পরবর্তী স্ত্রী থেকে হোক।

২- নারীর স্বামীর পিতা ও পিতামহ, এভাবে যত যত উপরের পর্যায়ের হোক, চাই তারা স্বামীর পিতৃসূত্রে দাদা কিংবা মাতৃসূত্রে দাদা হোক।

৩- কন্যাদের স্বামীরা, পুত্রদের কন্যাদের স্বামীরা, এবং কন্যাদের কন্যাদের স্বামীরা এভাবে যত নিচের স্তরের হোক।

এ উল্লিখিত তিনজনের ক্ষেত্রে শুধু বিয়ের আক্‌দ হওয়ার মাধ্যমেই মাহরাম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, এমনকি যদি তাদের মাঝে মৃত্যু, তালাক বা বিয়ে ভঙ্গের মাধ্যমে বিচ্ছেদও হয়ে যায়, তবুও এই মাহরাম সম্পর্ক তাদের জন্য স্থায়ী থাকে।

৪- মায়েদের স্বামী এবং দাদী/নানীদের স্বামীগণ, এভাবে যত উচ্চ স্তরেই হোক না কেন। তবে এই স্বামীগণ তাদের স্ত্রীদের কন্যা, স্ত্রীদের ছেলের কন্যা বা স্ত্রীদের মেয়ের কন্যার জন্য মাহরাম হিসেবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তারা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করে। যদি সহবাস ঘটে, তাহলে স্বামী তার স্ত্রীর পূর্ব বা পরের স্বামীর

সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: দুধ-ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হারাম, হাদীস নং(১৪৪৭); ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

কন্যা, স্ত্রীর ছেলের কন্যা বা মেয়ের কন্যাদের জন্য মাহরাম হিসেবে গণ্য হবেন- এমনকি পরবর্তীতে যদি তাদের মাঝে তালাকও হয়ে যায়। তবে যদি কোনো নারীর সাথে বিয়ে হয় কিন্তু সহবাসের আগেই তালাক দেওয়া হয়, তাহলে সে ঐ নারীর কন্যা, ছেলের কন্যা বা মেয়ের কন্যাদের জন্য মাহরাম হিসেবে গণ্য হবে না।

***

মুসাফিরের সালাত

ইসলাম ধর্ম সহজতা ও সহনশীলতার দ্বীন। এতে কোনো সংকীর্ণতা বা কঠোরতা নেই। আর যখনই কোনো কষ্টকর পরিস্থিতি দেখা দেয়, তখনই আল্লাহ তা'আলা সহজতার দরজা খুলে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿...هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ...﴾

"...তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। আর তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি...।" [সূরা আল-হজ্জ, আয়াত: ৭৮] আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الدِّينُ يُسْرٌ»[7].

"দ্বীন হল সহজ।"[1] আহলে ইলমগণ বলেছেন: "কঠোরতা সহজতা নিয়ে আসে।"

---

[1] সহীহ বুখারী, ঈমান পর্ব, অধ্যায়: দ্বীন সহজ, হাদীস নং (৩৯), আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

যেহেতু সফরে সাধারণত কষ্টের আশঙ্কা থাকে, তাই এ অবস্থার বিধানগুলো সহজ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

১- মুসাফির ব্যক্তি পানি না পেলে অথবা তার কাছে শুধুমাত্র খাওয়া-পান করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি থাকলে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয। তবে যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে সালাতের পছন্দনীয় ওয়াক্তের মধ্যেই পানির নিকট পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে পানি দিয়ে পবিত্র হওয়ার জন্য পানি পাওয়া পর্যন্ত সালাত বিলম্বিত করা উত্তম।

২. মুসাফিরের জন্য শরীয়তসম্মত বিধান হল, তিনি চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতকে (যোহর, আসর, এশা) দুই রাকাত কসর করে পড়বেন। এটি তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় থেকে শুরু হয়ে বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে—এমনকি যদি সফরের সময় দীর্ঘ হয় তবুও। কেননা সহীহ বুখারিতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»[8].

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন, এ সময়ে তিনি দু’ রাকাত করে সালাত আদায় করতেন।”[1] “তাবুকের যুদ্ধের সময়

[1] সহীহ বুখারী: “সালাত কসর করা সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: “কসর সালাত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে এবং কতদিন অবস্থান করলে তা কসর করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ দিন অবস্থান করা কালে সালাত কসর করে পড়েছেন।”[1]

কিন্তু কোনো মুসাফির যদি এমন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে যিনি চার রাকাত আদায় করেন (অর্থাৎ মুকীম ইমাম), তাহলে মুসাফিরও ইমামের অনুসরণে চার রাকাত পূর্ণ করবে—তা সে সালাতের শুরুতে ইমামকে পাক বা মাঝামাঝি সময়ে পাক। অতপর ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন মুসাফির অবশিষ্ট রাকাত পূর্ণ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»[10].

“ইমাম তো এজন্য নিযুক্ত হয়েছেন যাতে তার অনুসরণ করা হয়। অতএব, তোমরা তার সাথে বিপরীত করো না।”[2] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ এ বক্তব্যও এর প্রমাণ:

«فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»[11].

যাবে”, হাদীস নং (১০৮০), ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত।

[1] সুনানে আবু দাউদ: সফরের নামাযের শাখা সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: “যখন শত্রুদের ভূমিতে অবস্থান করবে তখন সালাত কসর করবে, হাদীস নং (১২৩৫), জাবির (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস।

[2] সহীহ বুখারী: আযান পর্ব, অধ্যায়: ইমাম তো এজন্য নিযুক্ত হয়েছেন যাতে তার অনুসরণ করা হয়,হাদীস নং (৬৮৯), এবং সহীহ মুসলিম সালাত পর্ব, অধ্যায়: মুক্তাদীর ইমামকে অনুসরণ, হাদীস নং (৪১১), আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস।

“ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করবে।”[1] ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "মুসাফির যখন একা সালাত আদায় করে তখন দুই রাকাত পড়ে, কিন্তু যখন কোনো মুকীম ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে তখন চার রাকাত পড়ে—এর কারণ কী?"
তিনি উত্তরে বলেন: “এটাই সুন্নাত।”[2] "ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সফরকালে যখন লোকদের (মুকীম ইমামের) সাথে সালাত আদায় করতেন, তখন চার রাকাত পূর্ণ করতেন; আর যখন একা সালাত আদায় করতেন, তখন দুই রাকাত (কসর করে) পড়তেন।"[3]

৩- মুসাফিরের জন্য শরীয়তসম্মত বিধান হল, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে যোহর-আসর এবং মাগরিব-এশা জমা করে পড়তে পারবে। যেমন: যদি সে নিরবচ্ছিন্নভাবে সফর অব্যাহত রাখে। এ ক্ষেত্রে উত্তম হল, (জমা তাকদিম বা জমা তাখির)- এর যে পদ্ধতিটি তার জন্য বেশি সুবিধাজনক তা অনুসরণ করা।

---

[1] সহীহ বুখারী, আযান পর্ব, অধ্যায়: সালাতের দিকে দ্রুত না গিয়ে প্রশান্তি ও সংযম সহকারে আসা উচিত, হাদীস নং (৬৩৬) এবং সহীহ মুসলিম: মসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ পর্ব, অধ্যায়: সালাতে শান্ত-প্রশান্তভাবে আসা মুস্তাহাব ও তাড়াহুড়া করে আসা নিষেধ, হাদীস নং (৬০২); আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস।

[2] মুসনাদে আহমাদ (১/২১৬)।

[3] সহীহ মুসলিম, মুসাফিরের সালাত পর্ব, অধ্যায়: মিনায় নামাজ সংক্ষিপ্ত করা প্রসঙ্গ, হাদীস নং: (৬৯৪)।

আর যদি তার জমা করার কোনো প্রয়োজন না থাকে, তবে জমা না করাই উত্তম। তবে যদি কেউ জমা' করেও ফেলে, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।

উদাহরণ স্বরূপ: কেউ এমন কোনো স্থানে অবতরণ করেছে, যেখান থেকে সে দ্বিতীয় সালাতের সময় প্রবেশের আগে রওনা হওয়ার মনস্থ করছে না। সেক্ষেত্রে সে প্রত্যেক ফরয সালাত তার নির্ধারিত সময়েই আদায় করবে; কারণ, তার জন্য জমা' করার কোনো প্রয়োজন নেই।

***

মীকাতসমূহ

"মীকাত" বলতে সেই স্থানগুলো বোঝায়, যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছেন যাতে হজ বা উমরাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সেখান থেকে ইহরামের নিয়ত করতে পারেন। সেগুলো পাঁচটি:

প্রথম মীকাত: যুল হুলাইফা - এটি আবইয়ারে আলী নামেও পরিচিত এবং কিছু লোক একে আল-হাসা বলেও নামকরণ করে থাকে। এটি মক্কা থেকে প্রায় দশ মঞ্জিল (প্রায় ৪৫০ কিমি) দূরে অবস্থিত। এটি মদিনাবাসী এবং যারা এই পথ দিয়ে মক্কা যায় তাদের জন্য নির্ধারিত মীকাত।

দ্বিতীয় মীকাত: আল-জুহফা: এটি একটি পুরাতন গ্রাম, এখান থেকে মক্কার দূরুত্ব পাঁচ মঞ্জিল। এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তাই বর্তমানে মানুষেরা তার

পরিবর্তে রাবেগ থেকে ইহরাম বাঁধে। এটি সিরিয়াবাসী ও যারা এ পথ দিয়ে যাবেন তাদের মীকাত।

তৃতীয় মীকাত: ইয়ালামলাম — এটি তিহামা অঞ্চলের একটি পাহাড় বা স্থান, তার ও মক্কা'র মাঝের দূরত্ব প্রায় দুই মঞ্জিল। এটি ইয়ামানবাসী এবং যারা এ পথ দিয়ে পাড়ি দেয় তাদের মীকাত।

চতুর্থ মীকত: কারনুল মানাজিল — এটিকে আস্-সাইল নামেও অভিহিত করা হয়। এটি ও মক্কার মাঝের দূরত্ব দুই মঞ্জিল। এটি নজদের অধিবাসী এবং যারা এ পথ দিয়ে অতিক্রম করে তাদের মীকাত।

পঞ্চম মীকাত: যাতু ইরক - এটি আদ-দারিবা নামেও পরিচিত। এটি মক্কা থেকে প্রায় দুই মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। এটি ইরাকবাসী ও এ পথ দিয়ে আগত হাজীদের মীকাত।

আর যারা এই মীকাতগুলোর তুলনায় মক্কার কাছাকাছি অবস্থান করে, তাদের মীকাত হলো তাদের নিজ অবস্থান স্থল; সেখান থেকেই তারা ইহরাম বাঁধবে, এমনকি মক্কাবাসীরা মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে; যদি তারা হজের জন্য ইহরাম বাঁধে।

আর যদি উমরার জন্য হয়, তবে তারা হিল এলাকা (মক্কার হারাম এলাকার বাইরে) থেকে ইহরাম বাঁধবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান বিন আবি বকর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু)-কে বলেছিলেন:

«اخْرُجْ بِأُخْتِكَ -يَعنِي عَائِشَةَ- مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ»[14].

"তোমার বোন (আয়েশা)-কে হারামের বাইরে নিয়ে যাও। তারপর সেখান থেকে যেন উমরাহর ইহরাম বাঁধে।"[1]

আর যার পথ এই মীকাতগুলোর ডান বা বাম পাশে হয়, সে যখন তার নিকটবর্তী মীকাত বরাবর পৌঁছাবে, তখন ইহরাম বাঁধবে।

আর যে বিমানে থাকে, সে যখন আকাশপথে মীকাত বরাবর অতিক্রম করে, তখন ইহরাম বাঁধবে। সেই অনুযায়ী, সে মীকাত বরাবর পৌঁছানোর আগেই প্রস্তুত হয়ে ইহরামের কাপড় পরে নিবে। অতঃপর যখন মীকাত বরাবর পৌঁছাবে, তখনই তাৎক্ষণিকভাবে ইহরামের নিয়ত করবে। এটা দেরি করা বৈধ নয়। কিছু মানুষ রয়েছেন যারা বিমানে থাকে এবং হজ বা উমরা করার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু তারা যখন মীকাত বরাবর পৌঁছে, তখন ইহরাম বাঁধে না, বরং বিমানবন্দরে নামা পর্যন্ত ইহরাম বিলম্ব করে যা বৈধ নয়, কারণ এটি আল্লাহ্‌র সীমা অতিক্রম করার শামিল। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ হজ বা উমরার ইচ্ছা না থাকা অবস্থায় মীকাত

---

[1] সহীহ বুখারী: হজ পর্ব, অধ্যায়: আল্লাহ্ তাআলার এই বাণী:
ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ
[সূরা আল-বাকারা: ১৯৭]; হাদীস নং (১৫৬০)।
এবং সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়:
ইহরামের বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা, ইফরাদ, তামাত্তু ও কিরান — এগুলোর বৈধতা, হজকে উমরার সাথে সংযুক্ত করার বৈধতা, এবং কিরানকারী কখন হালাল হবে, হাদীস নং (১২১১); আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা) থেকে বর্ণিত।

অতিক্রম করে, কিন্তু পরে সে হজ বা উমরার নিয়ত করে, তাহলে সে নিজ অবস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে এবং এতে তার ওপর কোনো কিছু বর্তাবে না।

আর যে ব্যক্তি এসব মীকাত অতিক্রম করে কিন্তু তার উদ্দেশ্য হজ্জ বা উমরাহ পালন করা নয়—বরং মক্কায় আত্মীয়র সাথে সাক্ষাৎ, ব্যবসা, জ্ঞানার্জন, চিকিৎসা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাবে, তার জন্য ইহরাম ওয়াজিব নয়। কেননা ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মীকাত নির্ধারণের পর বলেছেন:

«فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»[15].

"উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ ও 'উমরার নিয়তকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান।"[1] কাজেই তিনি মীকাতের বিধানকে শুধুমাত্র হজ বা উমরাহর নিয়তকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়—যারা হজ বা উমরার উদ্দেশ্য ছাড়া মক্কায় যায়, তাদের জন্য ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব নয়। আর যারা ইতিপূর্বে ফরয আদায়

[1] সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: মক্কাবাসীর হজ ও উমরার ইহরাম বাধার স্থান, হাদীস নং (১৫২৪); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: হজ ও উমরার মীকাতসমূহ, হাদীস নং(১১৮১); ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

করেছেন তাদের জন্য হজ বা উমরার নিয়ত করা আবশ্যকও নয়, কারণ হজ জীবনে একবার পালন করা ওয়াজিব। এ মর্মে নবী (সোল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

«الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ»[16].

"হজ একবারই (আবশ্যক)। যে একাধিকবার করবে, তার জন্য এটা নফল।"[1] তবে উত্তম হল—ব্যক্তি যেন নিজেকে নফল হজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করে, যাতে অতিরিক্ত সওয়াব অর্জন করতে পারে। এ সময় ইহরাম বাঁধা সহজসাধ্য হওয়ায়, আলহামদুলিল্লাহ। এটি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ।

***

হজের প্রকারভেদ

হজ তিন প্রকার: তামত্তু, ইফরাদ এবং কিরান।

তামাত্তু হজ হল: হজের মাসসমূহে শুধু উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা এবং মক্কায় পৌছার পর তাওয়াফ, সায়ী ও মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা। অতপর যখন তারবিয়ার দিন তথা যিলহজ্জের ৮ তারিখ হবে, তখন হজ্জের ইহরাম বাঁধবে ও হজের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

ইফরাদ হজ হল হল: শুধুমাত্র হজের জন্য ইহরাম বাঁধা। মক্কায় পৌঁছানোর পর, প্রথমে তাওয়াফে কুদূম

---

[1] সহীহ মুসলিম, হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: জীবনে একবার হজ ও উমরাহ ফরয, হাদীস নং(১৩৩৭) ও মুসনাদে আহমাদ (১/২৯০), শব্দবিন্যাস তারই; আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

করবে, তারপর হজের সায়ী করবে। তবে, সে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করবে না, এবং ইহরাম থেকে হালালও হবে না। বরং ইহরাম অবস্থায়ই থাকবে, অবশেষে ঈদের দিন "জামরা আকবা"তে পাথর নিক্ষেপের পর হালাল হবে। যদি হজের সায়ী হজের তাওয়াফের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

কিরান হজ হল: একজন ব্যক্তি হজ ও উমরা একসাথে আদায় করার নিয়ত করে। অথবা প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধে, তারপর তাওয়াফ শুরু করার আগেই হজকেও সেই ইহরামের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আর কিরান হজ আদায়কারী ব্যক্তির কাজ ইফরাদ হজ আদায়কারী ব্যক্তির কাজের মতোই, তবে কিরান হজ আদায়কারীর উপর হাদী (কোরবানি) আবশ্যক, কিন্তু ইফরাদ হজ আদায়কারীর উপর হাদী আবশ্যক নয়।

এই তিন প্রকার হজের মধ্যে তামাত্তু হজ সর্বোত্তম, যা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাহাবাদের করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে এতে উৎসাহিত করেছিলেন। এমনকি যদি কেউ কিরান বা ইফরাদ হজের ইহরাম বেঁধে থাকে, তাহলেও তার জন্য উমরাহতে রূপান্তর করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সে তামাত্তুকারী হয়ে যায়—এমনকি তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করার পর হলেও। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিদায় হজের বছর নিজে তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করার পর সকল সাহাবাকে

যাদের সাথে কুরবানির পশু (হাদি) ছিল না, তাদের ইহরামকে উমরাহতে রূপান্তর করতে, চুল কাটতে এবং ইহরাম থেকে হালাল হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

«لَوْ لَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ»[17].

"যদি না আমি হাদী (কুরবানীর পশু) নিয়ে আসতাম, তাহলে তোমাদের যে বিষয়ের নির্দেষ দিচ্ছি তা আমিও পালন করতাম।"[1]

আবার কখনও কোনো ব্যক্তি তামাত্তু হজের নিয়তে উমরার ইহরাম বাঁধে। অতঃপর আরাফার দিন (৯ জিলহজ্জ) আসার আগে তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না। এমন অবস্থায় সে উমরাহর ইহরামে হজকে যুক্ত করে কিরান হজে রূপান্তরিত করবে। নিচে দুটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বর্ণনা করবো:

প্রথম উদাহরণ: একজন নারী উমরার ইহরাম বাঁধলেন যা তিনি তামাত্তু হজে পরিণত করবেন। কিন্তু তাওয়াফ করার আগেই তিনি হায়েয বা নিফাসে আক্রান্ত হলেন এবং আরাফায় অবস্থানের দিন পর্যন্ত পবিত্র হতে পারলেন না। এমতাবস্থায় তিনি উমরার ইহরামকে হজের মধ্যে সংযুক্ত করার নিয়ত করবেন এবং কিরানকারিণী হয়ে যাবেন। অতঃপর তিনি নিজ

[1] সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ হজ প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৫৬৪); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: ইহরামের পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা, হাদীস নং(১২১৬); জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

ইহরামে অবিচল থাকবেন এবং অন্যান্য হাজীদের মতো সমস্ত কাজ করবেন। তবে তিনি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করবেন না—যতক্ষণ না তিনি পবিত্র হয়ে গোসল করেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ: একজন ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধলেন যা তিনি তামাত্তু হজে পরিণত করবেন। কিন্তু আরাফার দিনের আগে মক্কায় প্রবেশে কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলো, তাহলে তিনি উমরার ইহরামকে হজের মধ্যে সংযুক্ত করার নিয়ত করবেন এবং কিরানকারী হয়ে যাবেন। অতঃপর তিনি নিজ ইহরামে অবিচল থাকবেন এবং অন্যান্য হাজীদের মতো হজ্জের সমস্ত কাজ সম্পাদন করবেন।

***

যে ধরনের হজ সম্পাদনকারীর জন্য হাদী আবশ্যক

তামাত্তু ও কিরান হজ সম্পাদনকারীর জন্য হাদী আবশ্যক; কিন্তু ইফরাদ হজ সম্পাদনকারীর জন্য হাদী আবশ্যক নয়।

তামাত্তু হজ সম্পাদনকারী হলেন সেই ব্যক্তি যে হজের মাসগুলোতে (অর্থাৎ শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার পর) উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধে এবং তা থেকে হালাল হয়ে যায়, অতঃপর একই বছরে হজের জন্য ইহরাম বাঁধে। সুতরাং যদি কেউ শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার আগে উমরাহর ইহরাম বাঁধে, তবে সে তামাত্তু হজ সম্পাদনকারী নয় এবং তার উপর কোরবানী ওয়াজিব

হবে না—সে মক্কায় রমযানের সিয়াম পালন করুক বা না করুক। মক্কায় রমযানের সিয়াম পালনের এখানে কোনো প্রভাব নেই; মূল বিবেচ্য বিষয় হল উমরার ইহরাম বাঁধার সময়। যদি তা শাওয়াল মাসের আগে হয়, তবে তার উপর কোরবানী ওয়াজিব নয়। আর যদি শাওয়াল মাসের পরে হয়, তবে সে তামাত্তু হজ সম্পাদনকারী এবং ওয়াজিবের শর্ত পূরণ হলে তার উপর কোরবানী আবশ্যক।

অন্যদিকে, কিছু সাধারণ মানুষের ধারণা যে মক্কায় রমযানের সিয়াম পালন করার উপর এটি নির্ভর করে—অর্থাৎ যে মক্কায় সিয়াম পালন করবে তার উপর কোরবানী ওয়াজিব নয়, আর যে মক্কায় সিয়াম পালন করবে না তার উপর ওয়াজিব—এ ধারণা সঠিক নয়।

আর কিরান হজ সম্পাদনকারী হলেন সেই ব্যক্তি যে একসাথে উমরা ও হজের ইহরাম বাঁধে, অথবা উমরার ইহরাম বাঁধার পর তার তাওয়াফ শুরু করার আগেই হজকে এর সাথে যুক্ত করে নেয়।

আর তামাত্তু ও কিরান হজ সম্পাদনকারীর উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে যদি তারা মসজিদুল হারামের স্থানীয় বাসিন্দা না হয়। যদি তারা হারামের স্থানীয় বাসিন্দা হয়, তবে তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। মসজিদুল হারামের স্থানীয় বাসিন্দা বলতে হারামের অধিবাসী এবং এর এত নিকটবর্তী ব্যক্তিদের বোঝায় যে তাদের ও হারামের মাঝের দূরত্ব সফরের দূরত্ব হিসেবে পরিগণিত হয় না— যেমন আশ-শারায়ে' (মেক্কার

নিকটবর্তী এলাকার বাসিন্দা) ও অনুরূপ অঞ্চলের লোকজন। তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। অন্যদিকে, যারা হারাম থেকে এত দূরে থাকে যে তাদের ও হারামের মাঝের দূরত্ব সফরের দূরত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়— যেমন জেদ্দার বাসিন্দাগণ— তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব। আর যদি কোনো ব্যক্তি মক্কার স্থানীয় বাসিন্দা হয়, কিন্তু জ্ঞানার্জন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করে এবং পরে তামাত্তু হজ সম্পাদনকারী হিসেবে ফিরে আসে, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। কেননা বিবেচ্য বিষয় হল তার মূল বসবাস ও অবস্থানের স্থান আর তা হল মক্কা। তবে যদি সে মক্কা ছেড়ে অন্য কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, অতঃপর তামাত্তু হজ সম্পাদনকারী হিসেবে ফিরে আসে, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব— কারণ তখন সে আর হারামের স্থানীয় বাসিন্দা বলে গণ্য নয়।

তামাত্তু ও কিরান হজ সম্পাদনকারীর উপর ওয়াজিব হওয়া হাদী হল, এমন একটি ছাগল যা কুরবানীর জন্য যথেষ্ট হয়, অথবা একটি উটের এক সপ্তমাংশ, কিংবা একটি গরুর এক সপ্তমাংশ। যদি তা না পাওয়া যায়, তবে হজের সময় তিন দিন সিয়াম রাখবে এবং বাড়ি ফিরে সাত দিন সিয়াম রাখবে। এই তিন দিনের সিয়াম আইয়ামে তাশরিকেও (জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে) রাখা যাবে। অথবা উমরার ইহরাম বাঁধার পর থেকে এ সিয়ামগুলো রাখা যাবে, তবে

ঈদের দিনে বা আরাফার দিনে সিয়াম রাখা যাবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি ঈদের দিনে সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন এবং আরাফার দিনে আরাফায় অবস্থানকালে সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। এই তিন দিনের সিয়াম একাধারে বা বিচ্ছিন্নভাবে রাখা জায়েয, তবে আইয়ামে তাশরিকের পর পর্যন্ত এগুলোকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। আর অবশিষ্ট সাত দিনের সিয়াম বাড়ি ফেরার পর রাখতে হবে। চাইলে একাধারে রাখতে পারবে, আর চাইলে বিচ্ছিন্নভাবেও রাখতে পারবে।[1][2]

হাদীর পশু জবেহ করার দিন চারটি: ঈদের দিন (১০ই জিলহজ্জ) এবং তার পরের তিন দিন (১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্জ)। যে ব্যক্তি এই দিনগুলোর আগে জবেহ করবে, তার পশু সাধারণ গোশতের পশু হিসেবে গণ্য হবে, এবং তা হাদী হিসেবে যথেষ্ট হবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনের আগে নিজের হাদীর পশু জবেহ করেননি। বস্তুত হাদী

---

1 সুনানে আবু দাউদ: সিয়াম বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: আরাফার ময়দানে অবস্থানকারী ব্যক্তির আরাফার দিনে সিয়াম রাখা সম্পর্কে, হাদীস নং (২৪৪০); এবং সুনানে ইবনে মাজাহ: সিয়াম বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: আরাফার দিনের সিয়াম রাখা সম্পর্কে, হাদীস নং (১৭৩২); আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস।

2 সহীহ বুখারী: সিয়াম বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঈদুল ফিতরের দিনে সিয়াম রাখা প্রসঙ্গ , হাদীস নং (১৯৯০); এবং সহীহ মুসলিম: সিয়াম বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে সিয়াম রাখা নিষেধ প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১১৩৭); উমর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস।

হল হজের অনুষঙ্গীয় ইবাদতগুলোর একটি। আর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»[20].

"তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়ম গ্রহণ কর।"[1] অপর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন:

«كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»[21].

"আইয়ামে তাশরীকের সকল দিনই জবেহ করার দিন।"[2] আর আইয়ামে তাশরীক হল, ঈদের পরের তিন দিন।

এই দিনগুলোতে রাত বা দিনে কুরবানি করা জায়েয, তবে দিনে করা উত্তম। আবার মিনা ও মক্কা উভয় স্থানে কুরবানী করা জায়েয, কিন্তু মিনায় করা উত্তম। তবে যদি মক্কায় কুরবানী করলে গরীবদের বেশি উপকার হয়, আর মিনায় কুরবানীর উপকারিতা সীমিত হয়, তাহলে অধিক কল্যাণ ও উপকারের দিক বিবেচনা করা হবে। এই অনুযায়ী, কেউ যদি তার কুরবানীর পশু ১৩ই জিলহজ পর্যন্ত বিলম্ব করে মক্কায় জবেহ করে, তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

---

1 সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঈদের দিনে জামরাতুল 'আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করার সময় সওয়ার হয়ে করা মুস্তাহাব, এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী — «তোমরা তোমাদের হজের নিয়মাবলি আমার কাছ থেকে শিখে নাও»— এর ব্যাখ্যা, হাদীস নং (১২৯৭), জাবির (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস।

2 মুসনাদে আহমাদ (৪/৮২), জুবাইর বিন মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

আর জেনে রাখুন, সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর কোরবানী (হাদী) করা ওয়াজিব, আর যে ব্যক্তি হাদী পায় না, তার উপর সিয়াম রাখার বিধান— এটা বান্দার জন্য কোনো জরিমানা নয়, বা অহেতুক তার শরীরকে কষ্ট দেওয়া নয়। বরং এটি হজের পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতার অংশ। এটি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য এমন কিছু বিধান প্রবর্তন করেছেন, যার মাধ্যমে তাদের ইবাদত পূর্ণ হয়, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটবর্তী হয়, তাদের সওয়াব বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মর্যাদা উচ্চ হয়।

এ বিষয়ে ব্যয় করা প্রতিদানযোগ্য, আর এতে প্রচেষ্টা করা প্রশংসনীয়। তবে অধিকাংশ মানুষ এই ফায়েদার প্রতি লক্ষ্য করে না, আর এই সওয়াবের হিসাবও রাখে না। ফলে আপনি দেখবেন তারা হাদি (কুরবানী) ওয়াজিব হওয়া থেকে পলায়ন করতে চেষ্টা করে, আর যেকোনো উপায়ে তা থেকে মুক্তি পেতে চায়। এমনকি কেউ কেউ শুধু ইফরাদ হজ আদায় করে, যাতে তাদের উপর হাদি ওয়াজিব না হয়। এভাবে তারা নিজেদেরকে তামাত্তু' হজের সওয়াব ও হাদীর সওয়াব থেকে বঞ্চিত করে। আমাদের এ গাফিলতির প্রতি সতর্ক হওয়া উচিত।

উমরার পদ্ধতি

উমরার ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করলে, সাধারণ পোষাক থেকে মুক্ত হয়ে জানাবাতের গোসলের মতো গোসল করবে এবং সর্বোত্তম সুগন্ধি, যেমন ঊদ বা অন্য কিছু

দিয়ে, মাথা ও দাঁড়িতে সুগন্ধি লাগাবে। আর ইহরামের পরেও এটি থাকলে কোনো সমস্যা নেই। কেননা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أُرِيَ وَبِيصَ الْمِسْكِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ»[22].

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহরাম বাঁধার সংকল্প করতেন তখন তিনি যথাসাধ্য সর্বোত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। অতঃপর আমি তার মাথায় ও দাঁড়িতে সুগন্ধির শুভ্রতা দেখতে পেতাম।"[1]

ইহরামের সময় গোসল করা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সুন্নাত, এমনকি নিফাস ও হায়েয অবস্থায় থাকা নারীদের জন্যও। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা বিনতে উমাইসকে যখন তিনি প্রসূতি অবস্থায় ছিলেন, তখন ইহরামের সময় গোসল করতে, কাপড় দ্বারা পট্টি লাগাতে এবং ইহরাম বাঁধতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[2]

অতঃপর গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহারের পর ইহরামের কাপড় পরিধান করবে। তারপর হায়েয ও

---

1 সহীহ বুখারী: পোশাক বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: মাথা ও দাড়িতে সুগন্ধি ব্যবহার, হাদীস নং (৫৯২৩); সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ইহরাম বাধার সময় ইহরামকারীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার, হাদীস নং(১১৯০); আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

2 সহীহ মুসলিম, হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজের বিবরণ, হাদীস নং (১২১৮) জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

নিফাসগ্রস্তা নারী ব্যতীত অন্যরা যদি ফরয সালাতের সময় হয় তবে ফরয সালাত আদায় করবে, অন্যথায় ওযুর সুন্নাত হিসেবে দু'রাকাত সালাত আদায় করবে। সালাত শেষে ইহরাম বাঁধবে এবং বলবে:

«لَبَّيْكَ عُمْرَةً، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»[24].

উচ্চারণ: "লাব্বাইকা উমরাতান, লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক।"

অর্থ: "আমি উমরার জন্য হাযির, আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোনো অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই।"[1] পুরুষরা এটা উচ্চস্বরে বলবে, আর নারীরা এমন মৃদুস্বরে বলবে যেন তার পাশের ব্যক্তি শুনতে পায়।

তবে যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করে, কিন্তু তার হজ সম্পূর্ণ করার পথে কোনো বাধার আশঙ্কা করে, তার জন্য ইহরাম বাঁধার সময় শর্তারোপ করা উচিত। তাই ইহরাম বাঁধার সময় সে বলবে:

---

1 সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: তালবিয়া প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৫৪৯); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: তালবিয়া ও তার বিবরণ প্রসঙ্গ, হাদীস নং(১১৮৪); ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

«إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»[25]،
(إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)
অর্থ:“আর যদি আমাকে কোন বিষয় বাধা সৃষ্টি করে, তবে আমাকে যেখানে বাধা সৃষ্টি করা হবে, সেটিই আমার হালাল হওয়ার স্থান।”[1] অর্থাৎ: যদি রোগ, বিলম্ব বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা আমাকে আমার ইবাদত (হজ/উমরা) সম্পন্ন করা থেকে বিরত রাখে, তাহলে আমি আমার ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাব। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাআ বিনতে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে যখন তিনি অসুস্থ থাকা অবস্থায় ইহরাম বাঁধতে ইচ্ছা করেছিলেন, তখন তাকে শর্তারোপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:[2]

«فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ»[27].

"কারণ তোমার জন্য তোমার রবের নিকট তা-ই রয়েছে, যা তুমি শর্ত করেছ।”[3] অতএব, যে ব্যক্তি শর্তারোপ করে এবং পরবর্তীতে হজ সম্পন্ন করতে কোনো

---

1 সুনানে নাসায়ী: হজের কার্যাবলি বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: কেউ শর্ত আরোপ করতে চাইলে কীভাবে বলবে, হাদীস নং (২৭৬৬); ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

2 সহীহ বুখারী: বিবাহ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: দ্বীনের ক্ষেত্রে সমতা, হাদীস নং (৫০৮৯); সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: অসুস্থতা বা অন্য ওযরের কারণে হালাল হওয়ার শর্ত আরোপ করা জায়েয, হাদীস নং(১২০৭); আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

3 সুনানে নাসায়ী: হজের কার্যাবলি বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: কেউ শর্ত আরোপ করতে চাইলে কীভাবে বলবে, হাদীস নং (২৭৬৬); ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, তাহলে সে ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার উপর কোনো কাফফারা প্রযোজ্য হবে না।

আর যে ব্যক্তি তার হজ পূর্ণ করতে কোনো বাধার আশঙ্কা করে না, তার জন্য শর্তারোপ করা উচিত নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্তারোপ করেননি এবং সকলকে শর্তারোপ করার নির্দেশও দেননি। বরং তিনি শুধুমাত্র যুবাআ বিনতে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে তার অসুস্থতার কারণে শর্তারোপের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মুহরিম ব্যক্তির বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা উচিত, বিশেষ করে যখন কোনো অবস্থা বা সময়ের পরিবর্তন হয়। যেমন কোনো উঁচু স্থানে উঠলে, নিচু স্থানে নামলে বা রাত ও দিনের আগমন হলে। তালবিয়া পাঠের পর আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করবে এবং তাঁর রহমতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

আর তালবিয়া পাঠ উমরার ক্ষেত্রে ইহরামের শুরু থেকে তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত শরীয়তসম্মত এবং হজের ক্ষেত্রে ইহরামের শুরু থেকে ঈদের দিন জামরা আকাবায় পাথর নিক্ষেপ শুরু করা পর্যন্ত শরীয়তসম্মত।

যখন মক্কার নিকটবর্তী হবে তখন সেখানে প্রবেশের জন্য গোসল করা উচিত, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশকালে গোসল

করেছিলেন।[1] অতঃপর যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে তখন ডান পা আগে দিবে এবং বলবে:

«بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»[29]،

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ, ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্লী জুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্ লী আবওয়াবা রহমাতিকা। আ‘ঊযু বিল্লাহিল ‘আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল করীম, ওয়া সুলত্বানিহিল কাদীম, মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম।

অর্থ: “আল্লাহর নামে শুরু করছি, দরুদ ও সালাম রাসূলুল্লাহর ওপর, হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি অতীব মর্যাদা ও চিরন্তন পরাক্রমশালীর অধিকারী মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে।”[2] এরপর তাওয়াফ শুরু করার জন্য হাজরে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে যাবেন। ডান হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করবেন ও চুমু দেবেন। যদি চুমু দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সেই

---

1 সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া পাঠ প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৫৫৩); ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

2 সুনানে আবু দাউদ: সালাত পর্ব, অধ্যায়: মসজিদে প্রবেশের সময় কী বলবে, হাদীস নং (৪৬৬); ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

হাতে চুমু দেবেন। আর যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করাও সম্ভব না হয়, তবে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে হাত দিয়ে ইশারা করবেন, কিন্তু হাতে চুমু দেবেন না।

এক্ষেত্রে ভিড় না করা উত্তম, যাতে অন্যদেরকে কষ্ট দেওয়া না হয় এবং নিজেও কষ্ট না পান। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন:

«عُمَرُ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، لَا تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ»[30].

"হে উমার, তুমি একজন সবল ব্যক্তি, তুমি হাজরে আসওয়াদের নিকট ভীড় করো না, তাহলে তুমি দুর্বলদেরকে কষ্ট দেবে। যদি নিরিবিলি পাও তবে তা স্পর্শ কর। নচেৎ দূর থেকে তার দিকে মুখ করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "আল্লাহু আকবার" বল।"[1]

আর হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় বলবে:

«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ»[31].

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা ইমানান বিকা, ওয়া তাস্‌দীকান বিকিতাবিকা, ওয়া ওয়াফাআন বিআহদিকা, ওয়াত্তিবা'আন লিসুন্নাতি নবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অর্থ: "আল্লাহর নামে, আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ আপনার প্রতি ঈমান রেখে, আপনার কিতাবের প্রতি

[1] মুসনাদে আহমাদ (১/২৮), সম্মানিত গ্রন্থকার রহিমাহুল্লাহ, কিতাবটি দ্বিতীয়বার পর্যালোচনার সময় মন্তব্য করেছেন যে, এই হাদীসটি যঈফ।

দৃঢ়বিশ্বাস রেখে, আপনার অঙ্গিকার পূরণার্থে এবং আপনার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণার্থে এটি পালন করছি।”[1]

তারপর কাবা ঘরকে বাম পাশে রেখে ডান দিকে চলতে থাকবে। যখন রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছবে, চুম্বন করা ছাড়া তা স্পর্শ করবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে সেখাবে ভিড় করবে না। রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে বলবে:

﴿...رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন ও আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।“ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১]

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»[32]،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল-‘আফওয়া ওয়াল-‘আফিয়াতা ফিদ্দুনিয়া ওয়াল-আখিরাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও সুস্থতা প্রার্থনা করি।[2] যখনই হাজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন আল্লাহু

---

[1] ইবনে হাজার আত্-তালখীস আল-হাবীর গ্রন্থে (২/৪৭২) বলেন: আমি এটি এইভাবে পাইনি। তবে 'আল-মুহায্যাব' গ্রন্থের লেখক এটি জাবির (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।
মুনযিরী এবং নববী (রহ.) এর জন্য খালি জায়গা রেখেছেন,
এবং ইবনে ‘আসাকির এটি ইবনে নাজিয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তবে সেটির সনদ দুর্বল।

[2] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং (২৯৫৭)।

আকবার বলবে। আর তাওয়াফের বাকি অংশে পছন্দমত যে কোনো যিকির, দোয়া বা কুরআন পাঠ করতে পারে।

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ» [33].

"আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা'ঈ ও জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ প্রভৃতির লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা করা।"[1]

এই তাওয়াফে - অর্থাৎ আগমন করার পর প্রথম তাওয়াফে - পুরুষের জন্য দুটি কাজ করা উচিত:

এক: তাওয়াফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইযতিবা করা। ইযতিবার নিয়ম হল: সে তার চাদরের মধ্যভাগটি ডান বগলের নিচে রেখে, দুই প্রান্ত বাম কাঁধের উপর রাখবে। তাওয়াফ শেষ হওয়ার পর সে তার চাদরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে, কারণ ইযতিবা শুধুমাত্র তাওয়াফের সময়ই করতে হয়।

দুই: প্রথম তিনটি চক্করে রমল করা। রমল হল: দ্রুত হাঁটা এবং পদক্ষেপের মধ্যে কিছুটা ঘনত্ব রাখা। তবে বাকি চারটি চক্করে রমল করতে হয় না, বরং সেখানে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে।

---

1 সুনানে আবূ দাঊদ: হজ পর্ব, অধ্যায়: রমল করা প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৮৮৮); সুনানে তিরমিযী: হজ পর্ব, অধ্যায়: কীভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে? হাদীস নং (৯০২); আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস।

তাওয়াফের সাতটি চক্কর সম্পন্ন করার পর মাকামে ইবরাহীমের দিকে এগিয়ে যাবে এবং পড়বে:

﴿...وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ...﴾

"...তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর"...। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৫] তারপর তার পিছনে দুই রাকাত সালাত পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পড়বে:

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ 1﴾

"বলুন, 'হে কাফিররা!", অর্থাৎ সূরা কাফিরূন পড়বে। [সূরা আল-কাফিরূন, আয়াত: ১] আর দ্বিতীয় রাক'আতে পড়বে:

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ 1﴾

"বলুন, 'তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়," অর্থাৎ সূরা ইখলাস। [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১] সূরা ফাতিহার পরে।

যখন সে দুই রাকাত সালাত শেষ করবে, তখন হাজরে আসওয়াদের কাছে ফিরে যাবে এবং সম্ভব হলে তাকে স্পর্শ করবে।

অতঃপর সায়ীর স্থানের দিকে বের হবে এবং যখন সাফা পর্বতের নিকটবর্তী হবে, তখন তেলাওয়াত করবে:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ...﴾

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত...।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৮] এরপর সে সাফা পাহাড়ে এমন স্থান পর্যন্ত আরোহণ

করবে, যেখান থেকে কাবা দেখা যায়। সেখান থেকে কাবার দিকে মুখ করে হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং যত খুশি দোয়া করবে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»[34].

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়ীন ক্বদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ, আনজাযা ওয়া‘দাহ,
ওয়া নাসারা ‘আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ।

অর্থ: (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, মালিকানা তাঁর, তিনি সকল প্রশংসার প্রকৃত হকদার। তিনি জীবন-মৃত্যুদানকারী এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল (বিদ্রোহী) বাহিনীকে বিতাড়িত ও

পরাভূত করেছেন।)[1] এটি তিনবার পাঠ করবে এবং এর মাঝে অন্যান্য দোয়াও করবে।

এরপর সে সাফা থেকে মারওয়ার দিকে পায়ে হেঁটে রওনা হবে। যখন সবুজ চিহ্নের কাছে পৌঁছবে, তখন যতটুকু সম্ভব দ্রুত দৌড়াবে, তবে কাউকে কষ্ট দিবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে:

«أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى حَتَّى تُرَى رُكْبَتَاهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ، يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ»، وفي لفظ: «وَأَنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ»[35]

"তিনি সায়ী করতেন, এমনকি তার উভয় হাঁটু দৃশ্যমান হতো এবং তাঁর লুঙ্গি দৌড়ের তীব্রতায় ঘুরতে থাকত।" অপর বর্ণনায় আছে: "জোরে জোরে পা ফেলার কারণে তার চাঁদর এদিকে-সেদিকে দুলতে থাকত।"[2] যখন সে দ্বিতীয় সবুজ চিহ্নের নিকট পৌঁছবে, তখন স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে থাকবে, যতক্ষণ না মারওয়ায় পৌঁছে। সেখানে উঠে কিবলার দিকে মুখ করে হাত উঠাবে এবং সাফায় যা বলেছিল তা-ই বলবে। এরপর মারওয়া থেকে সাফায় দিকে রওনা করবে, হাঁটার জায়গায় হাঁটবে এবং দৌড়ানোর জায়গায় দৌড়াবে। সাফায় পৌঁছে প্রথমবারের মতোই করবে। এভাবে

---

[1] সহীহ মুসলিম, হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজের বিবরণ, হাদীস নং (১২১৮) জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

[2] মুসনাদ আহমাদ (৬/৪২১), হাবীবা বিনতে আবী তিজরাহ হতে বর্ণিত হাদীস।

মারওয়াতেও একই কাজ করবে, যতক্ষণ না সাত চক্কর পূর্ণ হয়। সাফা থেকে মারওয়ায় যাওয়া একটি চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে আসা আরেকটি চক্কর। সায়ীর সময় সে তার পছন্দনীয় যেকোনো যিকির, দোয়া বা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে।

অতঃপর যখন সে সাত চক্কর সম্পন্ন করবে, তখন পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করবে এবং মহিলা হলে প্রতিটি চুলের গোছা থেকে একআঙ্গুল পরিমাণ ছেঁটে দেবে।

মাথা মুণ্ডন সমস্ত মাথা থেকে হতে হবে, তেমনি চুল ছাঁটার ক্ষেত্রেও মাথার সব দিক থেকে ছাঁটতে হবে। আর মুণ্ডন করা ছাঁটার চেয়ে উত্তম, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার ও চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দোয়া করেছিলেন।, তবে যদি হজের সময় এত নিকটবর্তী হয় যে মাথার চুল পুনরায় গজানোর পর্যাপ্ত সময় না থাকে, তাহলে ছোট করা উত্তম; যেন হজের সময় মুণ্ডনের জন্য মাথার চুল থাকে। এর দলীল হল, বিদায় হজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে উমরার জন্য চুল ছোট করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ তারা ৪ জিলহজ্জ সকালে মক্কায় পৌঁছেছিলেন।[12]

---

[1] সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ হজ প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৫৬৪); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: ইহরামের পদ্ধতিসমূহের বর্ণনা, হাদীস নং(১২১৬); জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

[2] সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: হালাল হওয়ার সময় মাথা মুণ্ডন ও চুল ছোট করা প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৭২৭); এবং সহীহ মুসলিম: হজ

এই আমলগুলোর মাধ্যমে উমরাহ সম্পন্ন হবে। কজেই উমরার পর্যায়গুলো হবে: ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ করা, সায়ী করা এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা। এরপর ব্যক্তি পূর্ণভাবে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। তখন সে সাধারণ হালাল ব্যক্তির মতো সব ধরনের কাজ করতে পারে, যেমন সাধারণ পোশাক পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, স্ত্রী সহবাস করা প্রভৃতি।

***

হজের পদ্ধতি

যখন তারবিয়ার দিন আসে, অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ৮ম তারিখ হয়, তখন সে সকাল বেলায় তার অবস্থানস্থল থেকে হজের ইহরাম বাঁধবে। হজের ইহরাম বাঁধার সময় সে উমরার ইহরামের সময় যেসব কাজ করেছিল সেগুলোই করবে - যেমন গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, সালাত আদায় ইত্যাদি। তারপর হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধবে এবং তালবিয়া পাঠ করবে। হজের তালবিয়ার পদ্ধতি উমরার তালবিয়ার মতই, তবে এখানে সে বলবে: "লাব্বাইকা হাজ্জান" (হে আল্লাহ! আমি হজের জন্য উপস্থিত), উমরাহর সময় "লাব্বাইকা উমরাতান" বলার পরিবর্তে। আর যদি তার হজ সম্পূর্ণ করার পথে কোনো বাধার আশঙ্কা করে, তবে সে শর্তারোপ করে নিবে এবং বলবে:

সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: মুণ্ডন করা চুল ছোট করার চেয়ে উত্তম, এবং চুল ছোট করা জায়েয প্রসঙ্গ, হাদীস নং(১৩০১); ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

«وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»[38].

অর্থ:"আর যদি আমাকে কোন বিষয় বাধা সৃষ্টি করে, তবে আমাকে যেখানে বাধা সৃষ্টি করা হবে, সেটিই আমার হালাল হওয়ার স্থান।"[1] তবে যদি কোন বাধার আশঙ্কা না থাকে তবে শর্তারোপ করবে না।

এরপর সে মিনার দিকে রওনা হবে এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত কসর করে পড়বে (জমা ছাড়াই)। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় কসর করতেন কিন্তু জমা করতেন না।,

আর কসর হল, চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতকে দুই রাকাতে সংক্ষেপ করা। মক্কাবাসী ও অন্যান্যরা মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় কসর করবে, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে মক্কাবাসীদের সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন, কিন্তু তাদেরকে সালাত পূর্ণ করতে নির্দেশ দেননি। যদি তা তাদের উপর ওয়াজিব হতো, তবে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পূর্ণ করার নির্দেশ দিতেন, যেমন মক্কা বিজয়ের বছর তাদেরকে পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[2]

---

1 সুনানে নাসায়ী: হজের কার্যাবলি বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: কেউ শর্ত আরোপ করতে চাইলে কীভাবে বলবে, হাদীস নং (২৭৬৬); ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

2 সহীহ মুসলিম, হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজের বিবরণ, হাদীস নং (১২১৮) জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

অতঃপর যখন ৯ই যিলহজ আরাফার দিন সূর্য উদিত হবে, তখন সে মিনা থেকে আরাফার দিকে রওনা হবে এবং যদি সম্ভব হয় নামিরায় গিয়ে যোহর পর্যন্ত অবস্থান করবে। তবে যদি সম্ভব না হয়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ নামিরায় অবস্থান করা সুন্নাত।

অতঃপর যখন সূর্য ঢলে যাবে (যোহরের সময় হবে) তখন সে যোহর ও আসর সালাত দুই দুই রাকআত করে একত্রে জমা তাকদিম করে পড়বে, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন; যেন আরাফায় অবস্থান ও দোয়ার সময় দীর্ঘ হয়।

সালাতের পর সে যিকির, দোয়া ও আল্লাহর নিকট অনুনয়-বিনয় প্রকাশে মনোনিবেশ করবে এবং আল্লাহর কাছে নিজের পছন্দ

মাফিক প্রার্থনা করবে; হাত তুলে ও কিবলামুখী হয়ে, যদিও পাহাড় তার পিছনে হোক না কেন; কেননা কেবলামুখী হওয়া সুন্নাত, পাহাড়মুখী হওয়া নয়, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পহাড়ের নিকট দাঁড়িয়েছিলেন, আর বলেছেন:

«وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»[40]،

"আমি এখানে (আরাফায়) অবস্থান করলাম। তবে আরাফার সব জায়গাই হচ্ছে অবস্থানের জায়গা।"[1]

«وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ»[41].

[1] সুনানে ইবনে মাজাহ: হজ পর্ব, অধ্যায়: আরাফার অবস্থান স্থল, হাদীস নং (৩০১২), জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

“আর তোমরা বাতনে উরনা থেকে উঠে যাও।”[1]

আর এই শ্রেষ্ঠ স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বাধিক পঠিত যে দোয়াটি ছিল, তা হল:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»[42].

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়ীন ক্বদীর।

অর্থ: “আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।”[2]

যদি সে কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করে এবং তার সঙ্গীদের সাথে উপকারী আলোচনা করতে চায় বা উপকারী বই পড়তে চায়, বিশেষত আল্লাহর দয়া ও মহা অনুগ্রহ সম্পর্কে; যাতে সেই দিনে আশা-আকাঙ্খার বিষয়টি শক্তিশালী হয়, তবে এটি খুবই ভালো। এরপর সে পুনরায় আল্লাহর কাছে দোয়া ও মিনতি করবে এবং দিনটির শেষ সময়ে দোয়া করার প্রতি মনোযোগী থাকবে। কারণ সর্বোত্তম দোয়া হল আরাফার দিনের দোয়া।

---

1 সহীহ বুখারী: উমরা সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: হজ, উমরা বা যুদ্ধ থেকে ফিরার পর কি বলবে?, হাদীস নং (১৭৯৭); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: হজ বা অন্যান্য সফর থেকে ফিরে আসার সময় কী বলবে, হাদীস নং(১৩৪৪); ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

2 আল-মুহাল্লা (৩/১৬৫)।

অতঃপর যখন সূর্য অস্তমিত হবে, তখন সে মুযদালিফার দিকে রওনা হবে। মুযদালিফায় পৌঁছে সে মাগরিব ও এশার সালাত জমা করে পড়বে। তবে যদি কেউ এশার সময়ের আগেই মুযদালিফায় পৌঁছে যায়, তাহলে মাগরিব তার নির্দিষ্ট সময়েই পড়বে, তারপর এশার সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে নির্দিষ্ট সময়ে এশার সালাত পড়বে। এই মাসয়ালায় এটিই আমার অভিমত।

এ বিষয়ে দলীল হল, মাযহাবের আলেমগণের -রাহিমাহুমুল্লাহ- সালাতের সময় সম্পর্কিত বক্তব্য: তারা বলেছেন, মাগরিব সালাত সময়মতো পড়াই উত্তম, তবে মুহরিম অবস্থায় মুযদালিফায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে থাকলে সূর্যাস্তের সময় সেখানে না পৌঁছলে ভিন্ন কথা। যদি সূর্যাস্তের সময় সেখানে পৌঁছে যায়, তবে মাগরিব সালাত নির্দিষ্ট সময়েই পড়বে, বিলম্ব করবে না।

আর শরহুল ইকনাআ'তে উল্লেখ আছে:

"যদি মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিবের সালাতের সময় পায়, তবে বিলম্ব করবে না, বরং নির্দিষ্ট সময়েই পড়বে। কারণ এখানে দেরির কোনো অজুহাত নেই।" আর জমা সম্পর্কে তারা বলেছেন: "মুযদালিফায় মাগরিব সালাত বিলম্বে পড়বে।" এর কারণ হিসেবে তারা বলেছেন, মাগরিবের সময় মুযদালিফায় যাত্রার কাজে ব্যস্ত থাকে।

মালিকি মাযহাবের অভিমত: "যদি কেউ ইমামের সাথে অবস্থান করে তার সাথে যাত্রা করে, তবে

মুযদালিফায় জমা করবে। কিন্তু যদি ইমামের সাথে না থেকে একা অবস্থান করে বা ইমামের পরে যাত্রা করে, তবে মাগরিব ও এশা সালাত নিজ নিজ সময়ে পড়বে।" দেখুন: (জাওয়াহিরুল ইকলীল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১) ইবনে হাযম রহিমাহুল্ল এ বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করে বলেছেন:

"সে রাতে (৯ জিলহজ্জ সন্ধ্যায়) মাগরিবের সালাত মুযদালিফা ছাড়া অন্য স্থানে আদায় করলে শুদ্ধ হবে না, অপরিহার্যভাবে মুযদালিফায়-ই পড়তে হবে। আর অবশ্যই শাফাক (সন্ধ্যার লালিমা) অস্তমিত হওয়ার পর পড়তে হবে।, তার মন্তব্য এখানেই সমাপ্ত।[1]

সহীহ বুখারীতে ইবনে মাস'উদ রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

«أنَّه أَتَى المُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالعَتَمَةِ أَو قَرِيبًا مِن ذَلك، فَأمَرَ رَجُلًا فَأذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعدَهَا رَكعَتَينِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أمَرَ رَجُلًا فَأذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ رَكعَتَينِ». وَفِي رِوَايةٍ: «فَصَلَّى الصَّلَاتَينِ، كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالعِشَاءَ بَينَهُما»[44].

"এশার আযানের সময় বা তার কাছাকাছি সময় তিনি মুযদালিফা পৌঁছালেন। তিনি এক ব্যাক্তিকে আদেশ দিলেন। সে আযান ও ইকামত দিল। তিনি মাগরিব আদায় করলেন এবং এরপর আরো দু' রাক'আত আদায় করলেন। তারপর তিনি রাতের খাবার নিয়ে

[1] সহীহ বুখারী, হজ পর্ব, অধ্যায়: যারা মনে করেন উভয় সালাতের জন্য আলাদা আলাদা আযান ও ইকামাত দিতে হবে, হাদীস নং (১৬৭৫), আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

ডাকলেন এবং তা খেয়ে নিলেন। (রাবী বলেন) তারপর তিনি অপরজনকে আদেশ দিলেন। সে আযান ও ইকামত দিল। অতঃপর তিনি এশার দুই রাকাত আদায় করলেন।”

অপর বর্ণনায় আছে: “তখন তিনি পৃথক পৃথক আযান ও ইকামতের মাধ্যমে উভয় সালাত (মাগরিব ও এশা) আদায় করলেন এবং এই দু’ সালাতের মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিলেন।”[1]

কিন্তু যদি কারো জমা করার প্রয়োজন হয়; যেমন ক্লান্তি, পানির অভাব বা অন্যান্য কারণে তবে এশার সময় না আসলেও জমা করাতে কোন সমস্যা নেই। আর যদি কেউ আশঙ্কা করে যে মধ্যরাতের আগে মুযদালিফায় পৌঁছাতে পারবে না, তবে মুযদালিফায় পৌঁছার আগেই সালাত আদায় করে নেবে। সালাত মধ্যরাতের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয নয়।

তারপর মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করবে। যখন ফজর স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন আযান ও ইকামত সহকারে আগে আগে ফজরের সালাত আদায় করবে। এরপর মাশআরুল হারামের দিকে অগ্রসর হবে, সেখানে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা ও তাকবীর পাঠ করবে এবং ইচ্ছামতো দোয়া করবে, যতক্ষণ না ভালোভাবে ভোরের আলো পরিস্ফুটিত হয়। আর যদি

---

1 সহীহ মুসলিম, হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজের বিবরণ, হাদীস নং (১২১৮) জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

মাশআরুল হারামে যাওয়া সম্ভব না হয়, তবে নিজ স্থানেই দোয়া করবে। নবী কেননা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»[45].

"আমি এখানে (মাশআরুল হারামে) অবস্থান করলাম। তবে মুযাদালিফার সকল জায়গাই হচ্ছে অবস্থানের জায়গা।"[1] দোয়া করার সময় কিবলামুখী হয়ে উভয় হাত উত্তোলন করে দোয়া করবে।

যখন ভোরের আলো ভালোভাবে পরিস্ফুটিত হবে, তখন সূর্যোদয়ের আগেই সে মিনার দিকে রওনা হবে এবং ওদী মুহাসসিরে দ্রুত চলবে। মিনায় পৌঁছে সে জামরাতুল আকাবায় (মক্কার দিকের শেষ জামরা) সাতটি কঙ্কর একটির পর একটি ধারাবাহিকভাবে নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কঙ্কর খেজুরের আঁটির সমান আকারের হবে, প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ হলে, সে তার কুরবানীর পশু জবেহ করবে। এরপর পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করবে, আর নারী হলে চুল ছোট করবে, মুণ্ডন করবে না। এরপর সে মক্কায় যাবে এবং হজের তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করবে।

---

[1] সহীহ বুখারী: হজ পর্ব, অধ্যায়: "ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার ও ইহরামের পোষাক পরিধান, শিথি কাটা ও তেল ব্যবহার প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৫৩৯); সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ইহরাম বাধার সময় ইহরামকারীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার, হাদীস নং(১১৮৯); আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

সুন্নাত হল, যখন কঙ্কর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডনের পর মক্কায় তাওয়াফের জন্য রওনা হওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন সুগন্ধি ব্যবহার করবে। কেননা আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন:

"كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ"[46].

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার ইহরামের জন্য ইহরামে প্রবেশের আগে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম এবং হালাল হওয়ার জন্য বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার আগেও অনুরূপ করতাম।"[1]

এরপর তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করে মিনায় ফিরে যাবে, এবং সেখানে ১১ ও ১২ তারিখ রাত যাপন করবে। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে গেলে উভয় দিনে তিনটি জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

হেঁটে গিয়ে কঙ্কর মারাই উত্তম, তবে সওয়ার হয়ে গেলেও কোনো সমস্যা নেই। প্রথমে মক্কা থেকে সবচেয়ে দূরের জামরা (জামরাতুল উলা)-তে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, যা খাইফ মসজিদের নিকটবর্তী। সাতটি কঙ্কর একের পর এক নিক্ষেপ করবে, প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ হলে সামনে অগ্রসর হয়ে ইচ্ছামত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে

---

[1] সহীহ বুখারী: হজ পর্ব, অধ্যায়: বিদায়ী তাওয়াফ প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৭৫৫); এবং সহীহ মুসলিম: হজ পর্ব, অধ্যায়: বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব, তবে ঋতুবতী নারীর জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়, হাদীস নং(১৩২৭); ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

দোয়া করবে। যদি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দোয়া করা কঠিন হয়, তবে যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু দোয়া করবে, যদিও তা অল্প সময় হোক না কেন, যেন সুন্নাত আদায় হয়।

এরপর মধ্যম জামরা (জামরাতুল উসতা) লক্ষ্য করে সাতটি কঙ্কর একের পর এক নিক্ষেপ করবে, প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে বাম দিকে সরে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করবে। যদি দীর্ঘ দোয়া করা সম্ভব না হয়, তবে সাধ্য অনুযায়ী দাঁড়িয়ে দোয়া করবে। এই দাঁড়িয়ে দোয়া পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কেননা তা সুন্নাত। কিন্তু অনেকেই অজ্ঞতাবশত বা অবহেলায় এটি ছেড়ে দেয়। যেকোনো সুন্নাত যখন অবহেলিত হয়, তখন তা পালন করা এবং মানুষের মাঝে তা প্রচার করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যাতে এটি পরিত্যাজ্য ও বিলুপ্ত না হয়।

এরপর সে জামরাতুল আকাবায় সাতটি কঙ্কর একের পর এক নিক্ষেপ করবে, প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে সে ফিরে যাবে, সেখানে দোয়া করবে না।

দ্বাদশ তারিখে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ সম্পন্ন করার পর, যদি সে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চায়, তবে মিনা থেকে রওনা হবে। আর যদি বিলম্ব করতে ইচ্ছা করে তবে ত্রয়োদশ তারিখ রাত সেখানে অবস্থান করবে ও যোহরের পর পূর্বের ন্যায় তিনটি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। ত্রয়োদশ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব করা

উত্তম, তবে ওয়াজিব নয়। কিন্তু দ্বাদশ তারিখ সূর্যাস্তের সময় যদি সে মিনায় থাকে, তাহলে তার জন্য ত্রয়োদশ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব করে কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে দ্বাদশ তারিখ সূর্যাস্ত হয়ে যায় – যেমন রওনা হওয়া ও আরোহনের পর যানজট বা অন্য কোনো কারণে ফেরার পথে আটকে গিয়ে সূর্যাস্ত হয়ে যায়– তাহলে বিলম্ব করা ওয়াজিব হবে না, কারণ সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত তার বিলম্ব করা তার অনিচ্ছায় ঘটেছে।

অবশেষে যদি সে মক্কা থেকে নিজ দেশে ফেরার ইচ্ছা করে, তখন বিদায়ী তাওয়াফ না করা পর্যন্ত মক্কা ত্যাগ করবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»[47].

"তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মক্কা ত্যাগ না করে, যতক্ষণ না তার শেষ কাজ বাইতুল্লাহর সাথে (বিদায়ী তাওয়াফ) থাকে।"[1] অন্য বর্ণনায় এসেছে:

«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْت، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ»[48].

"মানুষদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেনো তাদের সর্বশেষ কাজ হয় বায়তুল্লাহর (বিদায়ী) তাওয়াফ। তবে

[1] সহীহ বুখারী: হজ পর্ব, অধ্যায়: বিদায়ী তাওয়াফ প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৭৫৫); এবং সহীহ মুসলিম: হজ পর্ব, অধ্যায়: বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব, তবে ঋতুবতী নারীর জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়, হাদীস নং(১৩২৮); ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

ঋতুবতী নারীর জন্য এ বিষয়ে শিথিল (মাফ) করা হয়েছে।”[1] সুতরাং হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীর জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা আবশ্যক নয় এবং তাদের জন্য মসজিদুল হারামের দরজায় গিয়ে বিদায় জানানোও উচিত নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোনো বর্ণনা আসেনি।

বিদায়ী তাওয়াফ হবে বাইতুল্লাহর সাথে তার শেষ কাজ, যখন সে সফরের জন্য রওনা দিতে ইচ্ছা করবে। বিদায় তাওয়াফের পর সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করা, মালপত্র গোছানো, বা রাস্তায় কিছু কেনাকাটা করার জন্য অবস্থান করায় কোনো অসুবিধা নেই। আর এতে বিদায় তাওয়াফ পুনরায় করতে হবে না, যতক্ষণ না সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন, যদি কেউ সকালে ভ্রমণের জন্য বিদায় তাওয়াফ করে, কিন্তু পরে ভ্রমণ সন্ধ্যা পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়, তাহলে আবার তাওয়াফ করা আবশ্যক হবে, যাতে তাওয়াফই কাবা ঘরের সাথে তার শেষ কাজ হয়।

***

মসজিদে নববীর যিয়ারত

যদি হাজী সাহেব হজের পূর্বে বা পরে মসজিদে নববী যিয়ারত করার ইচ্ছা করেন, তবে তিনি যেন শুধু

---

[1] সহীহ বুখারী: মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের ফযিলত সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের ফযীলত প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১১৮৯); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না, হাদীস নং(১৩৯৭); আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়ত করেন, কবর যিয়ারতের নয়। কারণ ইবাদতের উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা যায় না, বরং তা কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যেই করা যায় - মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তিনি বলেন:

«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»[49].

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফর করা যাবে না: মসজিদুল হারাম, আমার এ মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদে আক্বসা।"[1]

যখন তিনি মসজিদে নববীতে পৌঁছবেন, তখন ডান পা আগে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করবেন এবং বলবেন:

«بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعوذُ باللهِ العظيمِ وَبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ وَبِسُلْطَانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»[50]،

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ, ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। আল্লাহুম্মাগ্ফির্লী জুনূবী ওয়াফ্তাহ্ লী আবওয়াবা রহমাতিকা। আ'ঊযু বিল্লাহিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল করীম, ওয়া সুলত্বানিহিল কাদীম, মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম।

---

1 সুনানে আবু দাউদ: সালাত পর্ব, অধ্যায়: মসজিদে প্রবেশের সময় কী বলবে, হাদীস নং (৪৬৬); ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

অর্থ: “আল্লাহর নামে শুরু করছি, দরুদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অতীব মর্যাদা ও চিরন্তন পরাক্রমশালীর অধিকারী মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে।”[1] অতঃপর ইচ্ছামত সালাত আদায় করবেন।

উত্তম হলো রওযায় সালাত আদায় করা। আর রওযা হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর ও তার হুজরার (যেখানে তার কবর অবস্থিত) মধ্যবর্তী স্থান। কেননা এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা। আর যখন সালাত শেষ করে নবীর কবর যিয়ারত করার ইচ্ছা করবে, তখন আদব ও বিনয়ের সাথে তার কবরের সামনে দাঁড়াবে এবং বলবে:[2]

«السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ

---

1 সহীহ বুখারী: মক্কা ও মদীনার মসজিদে সালাতের ফযিলত সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের ফযিলত প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১১৮৯৬); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান হল জান্নাতের বাগানসমূহের মাঝে একটি বাগান, হাদীস নং(১৩৯১); আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৫০; এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০৬।

إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ[52]، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا، وَأَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، فَجَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّتِكَ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ».

উচ্চারণ: “আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আল্লাহুম্মা সাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা ‘আলা ইব্রাহীম, ওয়া ‘আলা আলে ইব্রাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আলে মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা ‘আলা ইব্রাহীম, ওয়া ‘আলা আলে ইব্রাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মজীদ। আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহি হাক্কান, ওয়া আন্নাকা কদ বাল্লাগ্তার্ রিসালাহ, ওয়া আদ্দাইতাল আমানাহ, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ, ওয়া জাহাদতা ফিল্লাহি হাক্কা জিহাদিহি, ফাজাযাকাল্লাহু আন উম্মাতিকা আফ্দালা মা জাযা নাবিইয়্যান ‘আন উম্মাতিহ”

অর্থ: হে নবী! আপনার উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সবধরনের নিরাপত্তা, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম ও ইবরাহীমের বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের বংশধরদের উপর বরকত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম ও ইবরাহীমের

বংশধরদের উপর বরকত নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল, আপনি নিশ্চয়ই রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মতকে নসিহত করেছেন এবং জিহাদ করেছেন আল্লাহর জন্যে সত্যিকারের জিহাদ। সুতরাং একজন নবীকে তার উম্মতের পক্ষ থেকে যে উত্তম বিনিময় প্রদান করা হয় তার চেয়ে উত্তম বিনিময় আল্লাহ আপনাকে দান করুন।[1]

এরপর ডান দিকে অল্প সরে গিয়ে আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে সালাম জানাবে এবং তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। অতঃপর আবার ডান দিকে অল্প সরে গিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে সালাম জানাবে এবং তার জন্যও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। যদি এ সময় উভয় সাহাবীর জন্য উপযুক্ত কোনো দোয়া করে, তবে তা ভাল।

কারো জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নবীর হুজরা স্পর্শ করা বা তার চারপাশে তাওয়াফ করা জায়েয নয়।

---

[1] সুনানে আবূ দাঊদ: জানাযা পর্ব, অধ্যায়: নারীদের করব যিয়ারত প্রসঙ্গ, হাদীস নং (৩২৩৬); সুনানে তিরমিযী: সালাত পর্ব, অধ্যায়: কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা মাকরূহ, হাদীস নং (৩২০); সুনানে নাসায়ী: জানাযা পর্ব, অধ্যায়: কবরের উপর বাতি প্রজ্জ্বলনে সতর্কতা, হাদীস নং (২০৪৩), ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

দোয়ার সময়ও সেদিকে মুখ করে দাঁড়াবে না, বরং কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হলো শুধুমাত্র সেই আমলগুলো যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রবর্তন করেছেন। আর সমস্ত ইবাদতের ভিত্তি হল সুন্নাতের অনুসরণ, বিদআত সৃষ্টি করা নয়।

নারীদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর বা অন্য কোনো কবর যিয়ারত করা জায়েয নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারিণী নারীদের, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে বাতি স্থাপনকারীদের উপর লা'নত (অভিশাপ) করেছেন।[1] তবে নারী তার স্ব স্ব স্থান থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করবে, যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছে যাবে, সে যেখানেই থাকুক না কেন। হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»[54].

"আর তোমরা আমার ওপর সালাত পাঠ কর, কারণ তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের সালাত আমার নিকট

[1] সুনানে আবু দাউদ: হজ পর্ব, অধ্যায়: কবর যিয়ারত প্রসঙ্গ, হাদীস নং (২০৪২), আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

পৌঁছে যায়।”[1] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন:

«إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»[55].

“নিশ্চয় জমিনে আল্লাহর কিছু বিচরণকারী মালায়েকা রয়েছেন, তারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার নিকট সালাম পৌঁছে দেয়।”[2]

নির্দিষ্টভাবে পুরুষদের জন্য বাকী‘ যা মদীনার কবরস্থান তা যিয়ারত করা মুস্তাহাব। সেখানে গিয়ে বলবে:

«السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا ومنكم وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»[56]،

উচ্চারণ: “আস-সালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়া’র, মিনাল মুমিনীন ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইনশা’আল্লাহু বিকুম লাহিকূন, ওয়া ইয়াহরমুল্লাহুল মুস্তাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা’খিরীন, নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আ্যাফিয়াহ।”

---

1 সুনানে নাসায়ী: সাহু পর্ব, অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম প্রদান, হাদীস নং (১২৮২), ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

2 সহীহ মুসলিম, জানাযা পর্ব, অধ্যায়: কবরস্থানে প্রবেশের সময় কী বলবে, ও কবরবাসীর জন্য দোয়া প্রসঙ্গ, হাদীস নং (৯৭৪-৯৭৫), আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে ও বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

অর্থ: “হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং যদি আল্লাহ চান, আমরা আপনাদের সাথে যুক্ত হবো। আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলকে রহমত দান করুন, আমি আল্লাহর কাছে আমাদের এবং আপনাদের নিরাপত্তা কামনা করছি।”[1]

«اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ»[57].

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজ্‌রাহুম, ওয়া লা তা'ফ্‌তিন্‌না বা'দাহুম, ওয়াগ্‌ফির্‌ লানা ওয়ালাহুম।

অর্থ: ”হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাদের প্রতিদান থেকে মাহরুম করবেন না, আর তাদের পরবর্তীতে আমাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করবেন না, আমাদেরকে এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।”[2]

আর যদি কেউ উহুদ যিয়ারত করতে চায়, এবং সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের সেই যুদ্ধে সংঘটিত প্রচেষ্টা, পরীক্ষা, শুদ্ধিকরণ ও শাহাদাতের ঘটনা স্মরণ করে, তারপর সেখানে শহীদ সাহাবীদের - যেমন নবীর চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে সালাম

---

1 সুনানে ইবনে মাজাহ: জানাযা পর্ব, অধ্যায়: কবরস্থানে প্রবেশের সময় কি বলা হবে, হাদীস নং (১৫৪৬); আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস।

2 সুনানে আবূ দাঊদ: হজ পর্ব, অধ্যায়: রমল করা প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৮৮৮); সুনানে তিরমিযী: হজ পর্ব, অধ্যায়: কীভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে? হাদীস নং (৯০২); আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস।

জানায়, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। বরং এটি পৃথিবীতে পরিভ্রমণের নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

***

ফায়েদাসমূহ

এগুলো হজ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা, যা বর্ণনা করা ও উপলব্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন:

প্রথম ফায়েদা: হজ ও উমরার আদব প্রসঙ্গে:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ 197﴾

“হজ হয় সুবিদিত মাসগুলোতে। তারপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ করা স্থির করে সে হজের সময় স্ত্রী-সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ, ও কলহ-বিবাদ করবে না। আর তোমরা উত্তম কাজ থেকে যা-ই কর আল্লাহ্ তা জানেন. আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِمارِ لِإِقامَةِ ذِكْرِ اللهِ»[58].

“আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সায়ী ও জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ প্রভৃতির লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা করা।”[1]

কাজেই বান্দার উচিত হজের সকল আনুষ্ঠানিকতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি সম্মান, মর্যাদাবোধ, ভালোবাসা ও বিনয়ের মাধ্যমে আদায় করা। সুতরাং এগুলোকে প্রশান্তি, গাম্ভীর্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুসরণের সাথে পালন করা কর্তব্য।

এই মহান নিদর্শনসমূহে বান্দার জন্য উচিত হলো যিকির, তাকবীর, তাসবীহ, তাহমীদ ও ইস্তিগফারে মশগুল থাকা; কেননা সে ইহরাম থেকে নিয়ে হালাল হওয়া পর্যন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে রয়েছে। কারণ হজ কোনো খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য ভ্রমণ করা নয়—যেখানে মানুষ সীমাহীনভাবে ইচ্ছেমতো আমোদ-প্রমোদ করতে পারবে, যেমনটি কিছু লোককে এমন করতে দেখা যায়। তারা এমন সব বাদ্যযন্ত্র ও গানবাজনার উপকরণ নিয়ে আসে যা তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় নিক্ষেপ করে। আবার কিছু মানুষকে দেখা যায়

---

[1] সহীহ বুখারী: জানাযা পর্ব, অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের কান্নার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়, যদি বিলাপ করা তাদের প্রচলিত রীতি হয়ে থাকে, হাদীস নং (১২৮৪); এবং সহীহ মুসলিম: জানাযা পর্ব, অধ্যায়: মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না করা প্রসঙ্গ, হাদীস নং (৯২৩); উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা, অযথা খেলাধুলা ও অন্যের প্রতি বিদ্রূপাত্মক আচরণ করে এবং এমন এমন নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত থাকে, যাতে মনে হয় হজের বিধান প্রবর্তনই করা হয়েছে, আনন্দ-ফুর্তি ও খেল তামাশা করার জন্য!

তাই হাজী ও অন্যদের উপর আল্লাহর ফরযকৃত সালাত যথাসময়ে জামাআতের সাথে আদায় করা, ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার প্রতি যত্ন নেওয়া অপরিহার্য।

মুসলিমদের উপকার করা ও প্রয়োজনে তাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রতি সদয় হওয়ার প্রতি আগ্রহী থাকা উচিত। বিশেষ করে দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করা, এমন স্থানে যেখানে সহানুভূতির বিশেষ প্রয়োজন— যেমন ভিড়ের জায়গা ইত্যাদিতে। কারণ সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করা স্রষ্টার দয়া লাভ করার কারণ হয়।

«وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»[59].

“আর আল্লাহ্ কেবলমাত্র তাঁর দয়ালু বান্দাদের ওপরই দয়া করে থাকেন।”[1]

তাকে অবশ্যই অশ্লীল কথা, পাপাচার, অবাধ্যতা এবং অহেতুক তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে।

---

[1] সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: মুহরিম ব্যক্তি কী ধরনের পোশাক পরিধান করবে, হাদীস নং (১৫৪৩); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: মুহরিম ব্যক্তির জন্য কী করা বৈধ আর কী বৈধ নয়, এবং তার জন্য সুগন্ধি হারাম হওয়া প্রসঙ্গ, হাদীস নং(১১৭৭); ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

তবে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিতর্ক করা প্রয়োজনের সময় ওয়াজিব। সৃষ্টির উপর যুলুম করা ও তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে; কাজেই পরনিন্দা, চোগলখুরি, গালাগালি ও মারধর করা এবং অপরিচিত নারীদের দিকে তাকানো থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। কেননা ইহরাম অবস্থায় বা সাধারণ সময়ে উভয় ক্ষেত্রেই এগুলো হারাম, তবে ইহরাম অবস্থায় এর নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর।

হাজীদের এমন সব কথা থেকে বিরত থাকা উচিত যা পবিত্র হজের স্থানগুলোর মর্যাদার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ; যা অনেক মানুষই করে থাকে। যেমন কিছু লোক জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় বলে: "আমরা শয়তানকে পাথর মারলাম!" এমনকি কখনো কখনো তারা হজের এ স্থানটিকে গালাগালি করে বা জুতো দিয়ে আঘাত করে প্রভৃতি - যা বিনয় ও ইবাদতের পরিপন্থী এবং জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের মূল উদ্দেশ্যের সাথেও সাংঘর্ষিক। কেননা জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের আসল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তাআলার যিকির প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয় ফায়েদা: ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ প্রসঙ্গে:

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ: ইহরাম অবস্থায় হজ বা উমরাকারীর জন্য যে সকল কাজ নিষিদ্ধ, সেগুলো তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: এমন নিষিদ্ধ কাজ যা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য হারাম। দ্বিতীয় প্রকার: এমন নিষিদ্ধ কাজ

যা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য হারাম। তৃতীয় প্রকার: এমন নিষিদ্ধ কাজ যা শুধুমাত্র নারীদের জন্য হারাম।

নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য যেসব কাজ হারাম, তা নিম্নরূপ:

১- যৌন মিলন: এটি ইহরামের সবচেয়ে গুরুতর নিষিদ্ধ কাজ, হজে প্রথম পর্যায়ের হালাল হওয়ার পূর্বে এ কাজ করলে তিনটি বিষয় প্রযোজ্য হবে:

এক: হজ বিনষ্ট হয়ে যাবে, তবে তাকে অবশ্যই হজের কার্যাদি চলমান রেখে তা সম্পন্ন করতে হবে।

দুই: পরবর্তী বছর পুনরায় সেই হজের কাযা আদায় করা ওয়াজিব, এমনকি সেটি নফল হজ হলেও।

তিন: কাযা হজ আদায়ের সময় উট জবেহ করতে হবে।

২. কামভাব নিয়ে নযর দেয়া বা স্পর্শ করা।

৩- হাত মোজা পরিধান করা।

৪- মাথা থেকে চুল অপসারণ করা মুণ্ডন বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে। অনুরূপভাবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী শরীরের অন্য কোনো অংশ থেকে চুল অপসারণ করা: তবে যদি তার চোখের উপর কোনো চুল নেমে আসে যা তাকে কষ্ট দেয় এবং তা তুলে ফেলা ব্যতীত কষ্ট দূর না হয়, তবে তা তুলে ফেলা যাবে এবং এর জন্য কোনো কাফফারা লাগবে না। ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির নিজ হাত দিয়ে মাথা চুলকানো জায়েয। যদি অনিচ্ছাকৃত কোন চুল পড়ে যায়, তবে তার উপর কোনো কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

৫- হাত ও পায়ের নখ কাটা: তবে যদি কোনো নখ ভেঙে যায় এবং তা দ্বারা কষ্ট হয়, তবে শুধুমাত্র আঘাতপ্রাপ্ত অংশ কাটা যাবে এবং এর জন্য তার উপর কোনো কাফফারা বর্তাবে না।

৬- ইহরামের পর শরীর, কাপড় বা অন্য কিছুর উপর সুগন্ধি ব্যবহার করা: ইহরামের আগে লাগানো সুগন্ধি ইহরাম অবস্থায় থাকলে তাকে ক্ষতি নেই; কারণ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ হল নতুন করে সুগন্ধি ব্যবহার করা, পূর্বের সুগন্ধি অবশিষ্ট থাকা নয়। ইহরামকারীর জন্য জাফরান মিশ্রিত কফি পান করা নিষিদ্ধ; কারণ জাফরান সুগন্ধির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি রান্নার মাধ্যমে এর গন্ধ ও স্বাদ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র রং অবশিষ্ট থাকে, তবে তাতে কোন সমস্যা নেই।

৭- শিকারী প্রাণী হত্যা করা: শিকার হল, স্থলজ বন্য হালাল প্রাণী, যেমন: হরিণ, খরগোশ, পায়রা, পঙ্গপাল ইত্যাদি। তবে সমুদ্রের শিকার হালাল, তাই ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তি সমুদ্র থেকে মাছ শিকার করতে পারবে। একইভাবে গৃহপালিত প্রাণী (যেমন মুরগি) জবেহ করাও তার জন্য জায়েয।

আর যদি পঙ্গপাল তার চলার পথে ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্য কোনো বিকল্প পথ না থাকে, তাহলে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু পঙ্গপালের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে তার উপর কোনো কাফফারা বর্তাবে না। কারণ

সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেনি এবং তার এ থেকে বাঁচারও কোনো উপায় নেই।

তবে ইহরাম অবস্থায় গাছ কাটা হারাম নয়; কারণ, ইহরামের উপর এর কোনো প্রভাব নেই। তবে হারাম এলাকার গাছ কাটা নিষিদ্ধ, তা ব্যক্তি মুহরিম হোক বা না হোক। এর ভিত্তিতে, আরাফার গাছ কাটা জায়েয, কারণ, তা হারাম এলাকার বাইরে, আর মিনা ও মুযদালিফায় গাছ কাটা নিষিদ্ধ, কারণ এগুলো হারাম এলাকার ভিতরে।

আর যদি হাঁটার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো গাছের ক্ষতি হয়, তবে তার উপর কোনো কাফফারা বর্তাবে না। পক্ষান্তরে মৃত গাছ কাটা নিষিদ্ধ নয়।

আর যেসব কাজ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ, তা দুই ধরনের:

১. সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা: সাধারণভাবে পরিধানকৃত পোশাক (যেমন শার্ট, টি-শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি) পুরুষের জন্য ইহরাম অবস্থায় এগুলো পরিধান করা জায়েয নয়। তবে যদি এগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় বাইরে পরা হয়—যেমন: শার্টকে চাদরের মতো করে জড়িয়ে নেওয়া, বা আবায়ার উপরের দিক নিচে করে পরা, তবে তাতে সমস্যা নেই। টুকরো জোড়া দেওয়া বা সেলাই করা চাদর বা লুঙ্গি পরতেও কোনো সমস্যা নেই।

তার জন্য বেল্ট, হাতঘড়ি, চশমা পরা এবং চাদর আটকানোর জন্য ক্লিপ বা পিন ব্যবহার করা জায়েয।

কারণ এসব জিনিস ব্যবহারের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিষেধাজ্ঞা আসেনি এবং এগুলো বর্ণিত নিষিদ্ধ পোশাকেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মুহরিম ব্যক্তির পরিধেয় বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন:

«لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، ولَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ»[60].

"জামা, পাগড়ী, পাজামা, টুপি এবং মোজা পরিধান করবে না।"[1] এখানে কি ধরনের পোশাক পরিধান করা যাবে এ প্রশ্নের উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কি ধরনের পোশাক পরা যাবে না তা বর্ণনা করা প্রমাণ করে যে, উল্লিখিত নিষিদ্ধ বস্তুগুলো ছাড়া অন্যান্য জিনিস মুহরিম ব্যক্তি পরতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম ব্যক্তিকে জুতা না পাওয়া গেলে মোজা পরার অনুমতি দিয়েছেন; পা রক্ষার প্রয়োজনে। একইভাবে চশমা পরাও জায়েয; কারণ তা চোখের সুরক্ষার প্রয়োজন। মাযহাবের ফুকাহাদের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী, পুরুষ মুহরিম ব্যক্তির জন্য আংটি পরা জায়েয।

---

1 সহীহ বুখারী: শিকারের প্রতিদান পর্ব, অধ্যায়: মুহরিম ব্যক্তির জুতা না পেলে মোজা পরিধান করা, হাদীস নং (১৮৪১); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: মুহরিম ব্যক্তির জন্য কী করা বৈধ আর কী বৈধ নয়, এবং তার জন্য সুগন্ধি হারাম হওয়া প্রসঙ্গ, হাদীস নং(১১৭৮); ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

মুহরিম ব্যক্তির জন্য লুঙ্গি (ইযার) না পেলে বা তা কেনার সামর্থ্য না থাকলে পায়জামা পরা জায়েয। একইভাবে জুতা না পেলে বা কেনার সামর্থ্য না থাকলে মোজা পরা যাবে।

কেননা ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দানে ভাষণ দানকালে বলেছেন:

«فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، ومَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبِسَ السَّرَاوِيلَ»[61].

"সুতরাং যে ব্যক্তি জুতা না পায়, সে মোজা পরবে, এবং যে ব্যক্তি ইযার (লুঙ্গি) না পায়, সে পায়জামা পরবে।"[1]

২- সরাসরি মাথা ঢেকে রাখা, যেমন পাগড়ি, গুতরা, টুপি বা এ ধরনের কোনো বস্তু দিয়ে মাথা আবৃত করা। তবে যদি মাথা সরাসরি না ঢাকে- যেমন তাঁবুর ছায়া, ছাতা ব্যবহার, গাড়ির ছাদের নিচে অবস্থান- তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই। কেননা নিষিদ্ধ হল, মাথা আবৃত করা ছায়া গ্রহণ নয়।

উম্মুল হুসাইন আল-আহমাসিয়্যা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন:

---

[1] মুসনাদে আহমাদ (৬/৪০২), সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঈদের দিনে (নহরের দিন) জামরাতুল 'আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করার সময় সওয়ার হয়ে করা মুস্তাহাব, এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী — «তোমরা তোমাদের হজের নিয়মাবলি আমার কাছ থেকে শিখে নাও» — এর ব্যাখ্যা, হাদীস নং (১২৯৮), উম্মুল হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) হতে বর্ণিত হাদীস।

«حَجَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ، أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُظَلِّلُهُ مِنَ الشَّمْسِ».

"আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিদায় হজ করেছি এবং আমি তাকে দেখেছি, তিনি জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করে সওয়ারীতে চড়ে ফিরে আসেন এবং তার সাথে ছিলেন বিলাল ও উসামা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)। তাদের একজন উটের লাগাম ধরে তা টেনে নিচ্ছিলেন এবং অপরজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার উপর কাপড় ধরে রেখেছিলেন; সূর্যের তাপ থেকে ছায়া প্রদানের জন্য।" অন্য বর্ণনায় এসেছে:

«يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

"তাকে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করছিলেন, জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের আগ পর্যন্ত।" মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ মুসলিম।[1] এ ঘটনা ঈদের দিনে প্রাথমিক হালাল হওয়ার আগে ঘটেছিল, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন ছাড়া অন্য দিনে হেঁটেই জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন, সওয়ারিতে আরোহণ করে নয়।[2]

---

[1] সুনানে আবু দাউদ: হজ পর্ব, অধ্যায়: পাথর নিক্ষেপ প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৯৬৯), ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

[2] সহীহ বুখারী: বাঁধাগ্রস্ত হওয়া বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ফিদিয়ার ক্ষেত্রে খাবার প্রদানের পরিমাণ হল অর্ধ সা, হাদীস নং (১৮১৬); সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: কষ্টদায়ক হলে মুহরিম ব্যক্তির জন্য মাথা মুণ্ডন

মুহরিম ব্যক্তির জন্য মাথায় মালামাল বহন করা জায়েয, যদি তার উদ্দেশ্য মাথা ঢাকা না হয়। অনুরূপভাবে তার জন্য পানিতে ডুব দেওয়াও জায়েয, এমনকি পানিতে মাথা ঢেকে গেলেও কোন অসুবিধা নাই।

শুধুমাত্র নারীদের জন্য যে বিষয়টি নিষিদ্ধ তা হল, নিকাব। নিকাব হলো এমন এক পর্দা যা দিয়ে নারী মুখ ঢেকে রাখে এবং শুধু চোখের জন্য এমনভাবে ফাঁক রাখে যাতে সে দেখতে পারে। কিছু আলেমের মতে, নেকাব বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে মুখ ঢাকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ— তবে যদি পুরুষরা তার কাছাকাছি স্থান দিয়ে চলাচল করে, তাহলে তার মুখ ঢাকা আবশ্যক, এক্ষেত্রে কাফফারা লাগবে না, মুখে কাপড় স্পর্শ করুক বা না করুক।

উল্লেখিত নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদনকারীর তিন অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: সে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় কোন ওযর ও প্রয়োজন ছাড়াই, এ ধরনের ব্যক্তি গুনাহগার এবং তাকে ফিদিয়া দিতে হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: প্রয়োজনের কারণে সে নিষিদ্ধ কাজ করে। যেমন— ইহরাম অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি এমন ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য জামা পরার প্রয়োজন বোধ করে, যেখানে তার ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তবে তা করতে পারবে। কিন্তু এর জন্য তাকে ফিদিয়া দিতে

জায়েয এবং এতে ফিদিয়া ওয়াজিব হবে ও এর পরিমাণের বর্ণনা, হাদীস নং(১২০১); কাব বিন উজরা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস।

হবে। যেমনটি কাব বিন উজরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল, তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হয়েছিল এমন অবস্থায় যে, উকুন তার মাথা থেকে চেহারার উপর গড়িয়ে পড়ছিল, ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাথা মুণ্ডন করার অনুমতি দেন এবং ফিদিয়া দিতে বলেন।[1]

তৃতীয় অবস্থা: ওযরের কারণে নিষিদ্ধ কাজ করে, যেমন অজ্ঞতাবশত, ভুলে, ঘুমন্ত অবস্থায় বা জোরপূর্বক কোনো নিষিদ্ধ কাজ করল। তখন তার গুনাহ হবে না এবং কাফফারাও দিতে হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡ...﴾

“আর এ ব্যাপারে তোমরা কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে (তা অপরাধ)...।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿...رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا...﴾

“হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না...।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬] আল্লাহ তা‘আলা এর উত্তরে বলেন:

---

[1] সহীহ মুসলিম, ঈমান বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: আল্লাহ তায়ালার বাণীর বর্ণনা, হাদীস নং (১২৬) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস।

«قَدْ فَعَلْتُ»[65].

"আমি তা করলাম।"[1]

হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[66].

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক যা করানো হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।"[2]

এগুলো সাধারণ দলীল যা ইহরামের নিষিদ্ধ কাজসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যা অজ্ঞতা, ভুলে যাওয়া বা জবরদস্তির কারণে কৃত কাজের জন্য পাকড়াও না করার প্রমাণ বহন করে। আর আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে শিকারের বিষয়ে বলেন; যা ইহরাম অবস্থার একটি নিষিদ্ধ কাজ:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ...﴾

"হে ঈমানদারগণ! ইহরামে থাকাকালে তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছে করে সেটাকে হত্যা করলে, যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু...।" [সূরা আল-

---

[1] সুনানে ইবনে মাজাহ: তালাক পর্ব, অধ্যায়: জোরপূর্বক ও ভূলবশত তালাক, হাদীস নং (২০৪৩), আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

[2] সহীহ মুসলিম, হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: শিশুর হজের বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৩৩৬) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীস।

মায়েদা, আয়াত: ৯৫] আল্লাহ তাআলা কাফফারা ওয়াজিব করেছেন শিকারীর ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার শর্তে। যেহেতু ইচ্ছাকৃত করা শাস্তি ও জরিমানার জন্য উপযুক্ত, তাই এটিকে বিবেচনায় নেওয়া ও তার সাথে হুকুমকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না হয়, তবে তার উপর কোনো কাফফারা বা গুনাহ নেই।

কিন্তু যখনই ওযর দূরীভূত হবে - যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি জানলে, ভুলে যাওয়া ব্যক্তি স্মরণ করলে, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হলে বা জবরদস্তির অবস্থা কেটে গেলে - তখনই সাথে সাথে নিষিদ্ধ কাজ বন্ধ করতে হবে। যদি ওযর দূর হওয়ার পরও নিষিদ্ধ কাজ চালিয়ে যায়, তবে সে গুনাহগার হবে এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।উদাহরণস্বরূপ: যদি কোনো পুরুষ ইহরাম অবস্থায় ঘুমের মধ্যে মাথা ঢেকে ফেলে, তবে যতক্ষণ সে ঘুমন্ত থাকবে ততক্ষণ তার উপর কোনো কিছু বর্তাবে না। কিন্তু যখন জাগ্রত হবে, তখনই তাকে সাথে সাথে মাথার আবরণ খুলে ফেলতে হবে। যদি জাগ্রত হওয়ার পরও (মাথা খোলা রাখা ওয়াজিব সম্পর্কে জেনেও) মাথা ঢেকে রাখে, তবে তাকে কাফফারা দিতে হবে।

উল্লেখিত নিষিদ্ধ কাজগুলোর ক্ষেত্রে ফিদিয়ার পরিমাণ নিম্নরূপ:

১- চুল বা নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা, বারবার কামনার দৃষ্টিতে তাকানোর

ফলে বীর্যপাত হওয়া, প্রথম হালাল হওয়ার পর সহবাস করা, উমরাহ অবস্থায় সহবাস করা, হাতমোজা পরিধান করা (নারীদের ক্ষেত্রে), পুরুষের সেলাইকৃত কাপড় পরা, পুরুষের মাথা ঢাকা এবং নারীর নেকাব পরা। এই সমস্ত ক্ষেত্রের প্রতিটির জন্য ফিদিয়া নিম্নরূপ; একটি ছাগল কুরবানী করা, অথবা ছয়জন মিসকিনকে খাবার দেওয়া, অথবা তিন দিন সিয়াম পালন করা। এই তিনটি বিকল্পের যেকোনো একটি চয়ন করে তা পালন করবে; কেননা আল্লাহ তাআলা মাথার চুল কাটা প্রসঙ্গে বলেছেন:

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ...﴾

"তোমাদের কোনো লোক যদি অসুস্থ হয় বা তার মাথা যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়...।" অত্র আয়াতের শেষ পর্যন্ত। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৬]। আর অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজগুলোকে এর উপর কিয়াস করা হবে। যদি কেউ ছাগল জবেহ করা বেছে নেয়, তবে সে একটি পুরুষ বা স্ত্রী ভেড়া বা বকরী/ছাগল জবেহ করবে যা কুরবানীর জন্য যথেষ্ট হয়, অথবা একটি উট বা গরুর সপ্তমাংশ দিবে। এর সমস্ত গোশত গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে, নিজে কিছু খাওয়া যাবে না। আর যদি মিসকিনদের খাওয়ানো বেছে নেয়, তবে প্রত্যেক মিসকিনকে আধা সা' খাবার দিতে হবে - খেজুর, গম বা অন্যান্য খাদ্যশস্য থেকে। আর যদি সিয়াম পালন বেছে নেয়, তবে তিন দিন সিয়াম রাখবে - চাইলে একসাথে অথবা আলাদা আলাদাভাবে রাখবে।

২- শিকারের কাফফারার বিধান হলো: যদি শিকার করা প্রাণীর সমতুল্য প্রাণী পাওয়া যায়, তবে তিনটি বিকল্পের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে পারবে; হয় সমতুল্য প্রাণী জবেহ করে সমস্ত গোশত মক্কার গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে, নতুবা ঐ প্রাণীর মূল্য হিসাব করে সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করে প্রতি মিসকীনকে আধা সা‘ হারে বিতরণ করবে, অথবা প্রতি মিসকীনের পরিবর্তে একদিন করে সিয়াম পালন করবে।

আর যদি শিকার করা প্রাণীর সমতুল্য প্রাণী না পাওয়া যায়, তবে দুটি বিকল্পের যেকোনো একটি বেছে নিবে: শিকার করা প্রাণীর মূল্য হিসাব করে সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করে প্রতি মিসকীনকে আধা সা‘ হারে বিতরণ করবে, অথবা প্রতি মিসকীনকে খাবার প্রদানের পরিবর্তে একদিন করে সিয়াম রাখবে।

যেসব শিকারের সমতুল্য প্রাণী রয়েছে তার উদাহরণ হল, পায়রা, যার সমতুল্য হিসেবে একটি ছাগল ধর্তব্য। সুতরাং কেউ যদি পায়রা শিকার করে তবে তার জন্য তিনটি বিকল্প রয়েছে: হয় সে একটি ছাগল জবেহ করবে, নতুবা ছাগলের মূল্যমান পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করে হারামের ফকীরদের মধ্যে বিতরণ করবে (প্রত্যেককে আধা সা‘ পরিমাণ), অথবা প্রতিটি মিসকীনের পরিবর্তে একদিন করে সিয়াম রাখবে।

আর যেসব শিকারের সমতুল্য প্রাণী নেই তার উদাহরণ হলো পঙ্গপাল। সুতরাং কেউ যদি

ইচ্ছাকৃতভাবে পঙ্গপাল হত্যা করে, তবে তার ক্ষেত্রে আমরা বলব: আপনি পঙ্গপালের মূল্য পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করে হারামের ফকীরদের মধ্যে বিতরণ করুন (প্রত্যেককে আধা সা' পরিমাণ), অথবা প্রতিটি মিসকীনের পরিবর্তে একদিন করে সিয়াম রাখুন।

৩- হজের মধ্যে প্রাথমিক হালাল হওয়ার পূর্বে যদি স্ত্রী সহবাস করে, তবে একটি উট ফিদিয়া দিবে।

তৃতীয় ফায়েদা: ছোটদের ইহরাম প্রসঙ্গে:

নাবালেগ শিশুর উপর হজ ওয়াজিব নয়, তবে যদি সে হজ করে তাহলে সে হজের সাওয়াব পাবে, কিন্তু বালেগ হওয়ার পর তাকে পুনরায় হজ করতে হবে। শিশুর পক্ষ থেকে তার অভিভাবক (পিতা, মাতা বা অন্য কেউ) ইহরাম বাঁধবেন। এ ক্ষেত্রে শিশু হজের সাওয়াব পাবে এবং অভিভাবকও এ কাজের সাওয়াব পাবেন। কেননা সহীহ হাদীসে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি শিশু উপস্থাপন করে বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, এই শিশুটির কি হজ হবে?" তিনি উত্তরে বললেন:

«نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»[67].

"হ্যাঁ, আর তোমার জন্য রয়েছে সওয়াব।"[1]

---

[1] সহীহ বুখারী: ওহির সূচনা সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কীভাবে ওহির সূচনা হয়েছিল, হাদীস নং(১); এবং সহীহ মুসলিম: নেতৃত্ব সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী: "নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপর

যদি শিশু মুমাইয়্যিয হয়, অর্থাৎ এমন শিশু যে বুঝতে পারে তাকে কী বলা হচ্ছে, তবে সে নিজেই ইহরামের নিয়ত করবে। তার অভিভাবক তাকে বলবে: "তুমি এরূপ ইহরামের নিয়ত কর", এবং সে হজের যেসব কাজ করতে সক্ষম; যেমন আরাফায় অবস্থান, মিনা ও মুযদালিফায় রাত্রি যাপন, তাকে সেগুলো করতে নির্দেশ দেবে। আর যেসব কাজ সে করতে সক্ষম নয়; যেমন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ, সেগুলো তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক বা অন্য কেউ আদায় করবে। কিন্তু তাওয়াফ ও সায়ীর ক্ষেত্রে যদি সে অপারগ হয়, তবে তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাকে বলা হবে: "তাওয়াফের নিয়ত কর", "সায়ীর নিয়ত কর"। এ অবস্থায়: যে তাকে বহন করছে, সেও নিজের জন্য তাওয়াফ ও সায়ীর নিয়ত করতে পারবে এবং শিশু নিজের জন্য নিয়ত করবে, ফলে একসাথে সবার তাওয়াফ ও সায়ী আদায় হয়ে যাবে; কারণ তাদের প্রত্যেকেই নিয়ত করেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»[68].

নির্ভরশীল", এবং এতে জিহাদ ও অন্যান্য কাজ অন্তর্ভুক্ত—হাদীস নং (১৯০৭); উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

“নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল রয়েছে।”[1]

আর যদি শিশু মুমাইয়্যিয না হয়, তবে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে ইহরামের নিয়ত করবে, কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং তাকে হজের পবিত্র স্থানসমূহে (আরাফা, মুযদালিফা, মিনাতে) উপস্থিত করবে। তাকে সাথে নিয়ে তাওয়াফ ও সায়ী করবে। এ অবস্থায় অভিভাবক একই তাওয়াফ ও সায়ী নিজের ও শিশুর পক্ষে একসাথে আদায় করার নিয়ত করতে পারবে না; কারণ শিশু এখানে কোনো নিয়ত বা আমল করেনি। বরং শুধুমাত্র অভিভাবক নিয়ত করেছে, আর একটি কাজ দু'জনের জন্য দুটি নিয়তে করা বিশুদ্ধ নয়। তবে শিশু মুমাইয়্যিয হলে ভিন্ন কথা, কেননা সে নিয়ত করতে পারে। আর আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে এটিই আমার অভিমত। সুতরাং প্রথমে অভিভাবক নিজের জন্য তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করবে, তারপর শিশুর জন্য শিশুকে নিয়ে আলাদাভাবে তাওয়াফ ও সায়ী করবে অথবা শিশুকে

---

[1] সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: হজ ওয়াজিব হওয়া ও তার ফযিলত প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৫১৩); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: শারীরিক অক্ষমতা, বার্ধক্য বা মৃত্যুর কারণে প্রতিনিধি দ্বারা হজ আদায়, হাদীস নং(১৩৩৪); ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট দিবে যে তাকে নিয়ে তাওয়াফ ও সায়ী করবে।

নাবালেগ শিশুর ইহরামের বিধান বালেগের ইহরামের মতোই, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, তার হজ হবে। সুতরাং যখন তার জন্য হজ সাব্যস্ত হল, তখন তার জন্য সকল বিধি-বিধান ও এর আবশ্যকীয় অনুসঙ্গ প্রযোজ্য হবে। কাজেই নাবালেগ শিশু ছেলে হলে সে বড় পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ সব বিষয় পরিহার করবে, আর নাবালেগ শিশু মেয়ে হলে সে বড় নারীর জন্য নিষিদ্ধ সব বিষয় পরিহার করবে। তবে শিশুর ইচ্ছাকৃত কাজ বড়দের ভুলের সমতুল্য, সুতরাং যদি শিশু নিজে থেকে ইহরামের কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে, তবে তার উপর বা অভিভাবকের উপর কোনো ফিদিয়া ওয়াজিব হবে না।

চতুর্থ ফায়েদা: হজে স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ প্রসঙ্গে:

যখন কোনো ব্যক্তির উপর হজ ওয়াজিব হয়, তখন যদি সে স্বয়ং হজ আদায় করার সামর্থ্য রাখে, তবে তার জন্য নিজে হজ করা ওয়াজিব। আর যদি সে নিজে হজ আদায়ে অক্ষম হয়, কিন্তু তার অক্ষমতা দূর হওয়ার আশা থাকে (যেমন রোগী যার সুস্থ হওয়ার আশা আছে), তবে সে সক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত হজ আদায় বিলম্বিত করবে। যদি সুস্থ হওয়ার আগেই সে মারা যায়, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করা হবে এবং এ কারণে তার উপর কোনো গুনাহ থাকবে না।

আর যদি হজ ওয়াজিব হওয়া ব্যক্তি এমন অক্ষম হয় যে তার অক্ষমতা দূর হওয়ার আশা নেই - যেমন বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা, অসুস্থ ব্যক্তি যার সুস্থ হওয়ার আশা নেই, বা যে বাহনে আরোহন করতে অক্ষম - তবে সে অন্য কাউকে হজের জন্য স্থলাভিষিক্ত বানাবে; কেননা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»[69].

"খাছআম গোত্রের এক মহিলা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর স্বীয় বান্দাদের উপর হজের ফরয আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমতাবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, তিনি বাহনের উপর চড়ে বসে থাকতে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ পালন করব?' তিনি বললেন: "হ্যাঁ"।"[1] এটি ছিল বিদায় হজের ঘটনায়।

হজের ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর পক্ষ থেকে বা নারী পুরুষের পক্ষ থেকে স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

আর যদি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি নিজের উপর হজ ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও হজ না করে থাকে, তবে সে অন্যের হজ আদায় করবে না; বরং প্রথমে সে নিজের

[1] সুনানে আবু দাউদ: হজ পর্ব, অধ্যায়: অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ পালন প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৮১১), এবং সুনানে ইবনে মাজাহ: হজ পর্ব, অধ্যায়: মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ পালন প্রসঙ্গ, হাদীস নং (২৯০৩), ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

হজ আদায় করবে। কেননা ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন: 'লাব্বাইক, আমি শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ করছি।' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন: 'শুবরুমা কে?' সে বলল: 'আমার ভাই অথবা আমার কোনো আত্মীয়।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুমি কি নিজের হজ করেছ?' সে বলল: 'না।' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'আগে নিজের হজ করো, তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে।" সুনানে আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।[1]

উত্তম হল, প্রতিনিধি যার পক্ষে হজ করছে তার নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবে এবং বলবে: "লাব্বাইকা আন ফুলান" (অমুকের পক্ষে হাজির হয়েছি), আর যদি নারীর পক্ষ থেকে হয়, তবে বলবে: "লাব্বাইকা আন উম্মি ফুলান" (অমুকের মায়ের পক্ষে হাজির হয়েছি) অথবা "লাব্বাইকা আন বিনতি ফুলান" (অমুকের মেয়ের পক্ষে হাজির হয়েছি)।

---

[1] সহীহ মুসলিম, হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজের বিবরণ, হাদীস নং (১২১৮) জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

আর যদি সে মনে মনে নিয়ত করে কিন্তু মুখে নাম উল্লেখ না করে, তবে তাতেও কোনো সমস্যা নেই। যদি সে যার পক্ষে হজ করছে তার নাম ভুলে যায়, তবে মনে মনে তার জন্য নিয়ত করবে, যদিও নাম স্মরণে না থাকে। বস্তুত আল্লাহ তাআলা সব জানেন, তাঁর কাছে কিছুই গোপন নয়।

প্রতিনিধির উপর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা এবং হজের আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণভাবে আদায় করতে আগ্রহী থাকা ওয়াজিব; কেননা সে এ ব্যাপারে আমানতদার। কাজেই সে সকল ওয়াজিব কাজ যথাযথভাবে আদায় করতে, সকল নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকতে এবং সাধ্য অনুযায়ী সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজগুলো সম্পন্ন করতে সচেষ্ট থাকবে।

পঞ্চম ফায়েদা: ইহরামের কাপড় পরিবর্তন প্রসঙ্গ:

হজ বা উমরাহর জন্য মুহরিম ব্যক্তি; সে পুরুষ হোক বা নারী তার জন্য যে কাপড়ে ইহরাম বেঁধেছে তা পরিবর্তন করে অন্য কাপড় পরিধান করা জায়েয, যদি পরিবর্তিত কাপড় এমন হয় যা মুহরিমের জন্য পরিধান করা বৈধ। অনুরূপভাবে ইহরাম বাঁধার সময় যে ব্যক্তি খালি পায়ে ছিল, তার জন্য পরে জুতা পরা জায়েয।

ষষ্ঠ ফায়েদা: তাওয়াফের দুই রাকাত সালাতের স্থান প্রসঙ্গে:

যে ব্যক্তি তাওয়াফ শেষ করেছে তার জন্য মাকামে ইবরাহিমের পিছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করা সুন্নাত। যদি মাকামের নিকটস্থ স্থান প্রশস্ত হয় তবে

সেখানেই সালাত পড়বে, যদি প্রশস্ত না হয় তবে দূরবর্তী স্থানে পড়বে, এ সময় মাকামে ইবরাহিমকে তার ও কাবার মাঝে রাখবে। ফলে সে 'মাকামের পিছনে সালাত আদায় করেছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ করেছে বলে গণ্য হবে। যেমনটি জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজের বিবরণে এসেছে:

"أَنَّهُ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ ٱلْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْبَيْتِ"[71].

“তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তার ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রেখে সালাত আদায় করলেন।”[1]

সপ্তম ফায়েদা: সায়ী ও তাওয়াফের মাঝে অবিছিন্নতা রক্ষা প্রসঙ্গে:

উত্তম হলো তাওয়াফের পর পরই সায়ী করা। তবে যদি কেউ উভয়ের মাঝে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান দেয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, যেমন সকালে তাওয়াফ করে সায়ী বিকেলে আদায় করা অথবা রাতে তাওয়াফ করে সায়ী দিনে আদায় করা। আর সায়ীর সময় ক্লান্ত

---

[1] আবূ দাঊদ, হজের কার্যাদি পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান পেল না, হাদীস নং (১৯৪৯); তিরমিযী, হজ পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুযদালিফায় ইমামকে পাবে সে হজ পেল বলে গণ্য হবে, হাদীস নং (৮৮৯); নাসায়ী, অধ্যায়: হজের কার্যাদি পর্ব, অধ্যায়: আরাফার ময়দান অবস্থান ফরয হওয়া প্রসঙ্গে, হাদীস নং (৩০১৬); ইবন মাজাহ, হজ পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে ফজরের পূর্বে আরাফাতে আসে, হাদীস নং (৩০১৫); আব্দুর রহমান ইবন ইয়া‘মার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

হলে বসে বিশ্রাম নেওয়া জায়েয। বিশ্রামের পর পুনরায় হেঁটে অথবা হুইল চেয়ার ইত্যাদি বাহনে চড়ে বাকি সায়ী সম্পন্ন করবে।

সায়ীর সময় যদি সালাতের ইকামত হয়, তবে সে সালাতে শরীক হবে। সালাত শেষে সে সায়ী সেই স্থান থেকে সম্পন্ন করবে যেখানে ইকামতের আগে সে পৌঁছেছিল।

অনুরূপভাবে যদি কেউ তাওয়াফরত অবস্থায় সালাতের ইকামত দেয়া কিংবা জানাযা উপস্থিত হয়, তবে সে সালাত আদায় করবে। সালাত শেষে সে তাওয়াফ সেই স্থান থেকে সম্পন্ন করবে যেখানে সালাতের আগে সে পৌঁছেছিল। আবার শুরু থেকে তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই। এটি আমার নিকট অগ্রগণ্য মত। কেননা, সালাতের কারণে ছেড়ে দেওয়াটা যেহেতু অনুমোদিত, তাই তা ক্ষমাযোগ্য। এখানে পূর্বের চক্কর বাতিল হওয়ার কোনো দলীল নেই।

অষ্টম ফায়েদা: তাওয়াফ বা সায়ীর সংখ্যায় সন্দেহ প্রসঙ্গে:

যদি তাওয়াফকারী তাওয়াফের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে পতিত হয়, তবে: যদি ব্যক্তি প্রায়ই সন্দেহে ভোগে (যেমন ওয়াসওয়াসার সমস্যা রয়েছে), সে এই সন্দেহের প্রতি মনোযোগ দেবে না। আর যদি ব্যক্তি অধিক সন্দেহ পোষণকারী না হয়, তার ক্ষেত্রে যদি তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর তার সন্দেহ হয় তবে সে এদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না, কিন্তু যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে কিছু

কম হয়ে গেছে তাহলে বাকিটুকু পূরণ করবে। আর যদি তাওয়াফ চলাকালীন সন্দেহ হয়, উদারহণস্বরূপ যদি তার সন্দেহ হয় যে সে এখন তৃতীয় না চতুর্থ চক্কর রয়েছে, তখন যদি তার কাছে কোনো একটির সম্ভাবনা বেশি প্রাধান্য মনে হয় তবে সেই অনুযায়ী আমল করবে। আর যদি কোনোটিই প্রাধান্য না পায় তবে নিশ্চিত সংখ্যা অর্থাৎ কম সংখ্যাটি ধরে নেবে।

উল্লিখিত উদাহরণে: যদি তার কাছে তিন নম্বর চক্কর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি মনে হয়, তবে সে এটিকে তৃতীয় চক্কর গণনা করে বাকী চারটি চক্কর সম্পন্ন করবে। আর যদি চার নম্বর চক্কর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি মনে হয়, তবে এটিকে চতুর্থ চক্কর ধরে বাকী তিন চক্কর আদায় করবে। কিন্তু যদি কোনোটিই প্রাধান্য না পায়, তবে নিশ্চিত সংখ্যা তিন ধরে অতিরিক্ত চারটি চক্কর আদায় করবে।

সায়ীর চক্কর সংখ্যা নিয়ে সন্দেহের বিধান তাওয়াফের চক্কর সংখ্যা নিয়ে সন্দেহের মতই, পূর্বে আলোচিত সকল ক্ষেত্রে।

নবম ফায়েদা: আরাফায় অবস্থান প্রসঙ্গে:

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাজীর জন্য উত্তম হল, যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে হজের ইহরাম বেঁধে মিনায় গমন করা এবং সেখানে দিনের বাকি সময় ও ৯ তারিখের রাত অবস্থান করা। অতঃপর ৯ তারিখ সকালে আরাফাতের দিকে রওনা হওয়া। এটি উত্তম পদ্ধতি। তবে যদি কেউ মিনায় না গিয়ে সরাসরি আরাফাতের

দিকে চলে যায়, তবে সে উত্তম বিষয় ত্যাগ করল, কিন্তু তার উপর কোনো গুনাহ নেই।

আরাফায় অবস্থানকারীর জন্য এর সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। কেননা কিছু হাজী অজ্ঞতাবশত বা অন্যদের অনুসরণ করে আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান করেন। যারা আরাফার সীমানার বাইরে অবস্থান করেন, তাদের হজ হয় না, কারণ তারা প্রকৃতপক্ষে আরাফায় অবস্থান করেননি। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الْحَجُّ عَرَفَةُ»[72].

“আরাফায় অবস্থান করাই হল হজ।”[1] আরাফার ময়দানের যে কোন স্থানে অবস্থান করলেই তা যথেষ্ট হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»[73].

“আমি এখানে (আরাফার এ স্থানে) অবস্থান করলাম। তবে আরাফার সব জায়গাই হচ্ছে অবস্থানের জায়গা।”[2]

---

1 সহীহ মুসলিম, হজ পর্ব, অধ্যায়: আরাফার সব জায়গাই অবস্থানের জায়গা, হাদীস নং (১২১৮); জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

2 সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঈদের দিনে জামরাতুল ‘আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করার সময় সওয়ার হয়ে করা মুস্তাহাব, এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী — «তোমরা তোমাদের হজের নিয়মাবলি আমার কাছ থেকে শিখে নাও» — এর ব্যাখ্যা, হাদীস নং (১২৯৭), জাবির (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস।

আর আরাফার সীমানার মধ্যে অবস্থানকারীর জন্য সূর্যাস্তের আগে সেখান থেকে ফিরে যাওয়া জায়েয নয়; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করেছিলেন এবং তিনি বলেছেন:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»[74].

"তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়ম গ্রহণ কর।"[1]

আরাফায় অবস্থানের সময়সীমা ঈদের দিন ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। যে ব্যক্তি ঈদের দিন ফজর উদয় হওয়ার আগে আরাফায় অবস্থান করতে পারবে না, তার হজ ছুটে যাবে। সুতরাং যদি সে ইহরামের শুরুতে এই শর্তারোপ করে থাকে যে:

«إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»[75]،

(إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

অর্থ:"আর যদি আমাকে কোন বিষয় বাধা সৃষ্টি করে, তবে আমাকে যেখানে বাধা সৃষ্টি করা হবে, সেটিই আমার হালাল হওয়ার স্থান।"[2] তাহলে সে ইহরাম থেকে

---

[1] সুনানে নাসায়ী: হজের কার্যাবলি বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: কেউ শর্ত আরোপ করতে চাইলে কীভাবে বলবে, হাদীস নং (২৭৬৬); ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

[2] সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঈদের দিনে (নহরের দিন) জামরাতুল 'আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করার সময় সওয়ার হয়ে করা মুস্তাহাব, এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী — «তোমরা তোমাদের হজের নিয়মাবলি আমার কাছ থেকে শিখে নাও» — এর ব্যাখ্যা, হাদীস নং (১২৯৭), জাবির (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস।

হালাল হয়ে যাবে এবং তার উপর কোনো কিছুই বর্তাবে না। আর যদি শর্তারোপ না করে থাকে এবং আরাফায় অবস্থান ছুটে যায়, তবে সে উমরাহর মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবে- সে বাইতুল্লাহয় গিয়ে তাওয়াফ ও সায়ী করবে, মাথা মুণ্ডন করবে এবং সাথে কুরবানীর পশু থাকলে তা যবেহ করবে। অতঃপর পরবর্তী বছরে ছুটে যাওয়া হজ পুনরায় আদায় করবে এবং নতুন করে কুরবানীর পশু কুরবানী দিবে। যদি কুরবানীর পশু না পায়, তবে তিন দিন হজের সময় এবং বাড়ি ফিরে সাত দিন সিয়াম রাখবে।

দশম ফায়েদা: মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে:

সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য ঈদের দিন ফজরের সালাত আদায়ের আগে মুযদালিফা থেকে রওনা হওয়া জায়েয নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের রাতে সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং ফজরের সালাত আদায় না করা পর্যন্ত সেখান থেকে রওনা হননি। আর তিনি বলেছেন:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»[76].

“তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়ম গ্রহণ কর।”[1]

[1] সহীহ বুখারী: হজ পর্ব, অধ্যায়: যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের রাত্রে পূর্বেই প্রেরণ করে মুযদালিফায় অবস্থান করে ও দু'আ করে এবং পূর্বে প্রেরণ করবে চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার পর, হাদীস নং (১৬৮০); সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: দুর্বল ব্যক্তি, বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য রাতের শেষাংশে মানুষের ভিড় শুরু হওয়ার আগেই মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে রওনা হওয়া মুস্তাহাব। অন্যদের জন্য মুযদালিফায় অবস্থান করে ফজরের সালাত আদায় করে মিনার দিকে

সহীহ মুসলিমে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন: “সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মুযদালিফার রাতে তার পূর্বে এবং মানুষের ভিড়ের আগেই রওয়ানা হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। আর তিনি ছিলেন ধীরগতির মহিলা তথা স্থুলদেহী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে ফিরে গেলেন। আর আমরা সকাল পর্যন্ত সেখানেই রয়ে গেলাম। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা রওয়ানা হলাম।“[1]

অন্য বর্ণনায় এসেছে: “আমার আকাঙ্ক্ষা, আমিও যদি সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার অনুরূপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করতাম! ফলে মিনায় পৌছে ফজরের সালাত

রওনা হওয়া মুস্তাহাব, হাদীস নং(১২৯০); আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

[1] সহীহ বুখারী: হজ পর্ব, অধ্যায়: যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের রাত্রে পূর্বেই প্রেরণ করে মুযদালিফায় অবস্থান করে ও দু‘আ করে এবং পূর্বে প্রেরণ করবে চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার পর, হাদীস নং (১৬৮১); সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: দুর্বল ব্যক্তি, বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য রাতের শেষাংশে মানুষের ভিড় শুরু হওয়ার আগেই মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে রওনা হওয়া মুস্তাহাব। অন্যদের জন্য মুযদালিফায় অবস্থান করে ফজরের সালাত আদায় করে মিনার দিকে রওনা হওয়া মুস্তাহাব, হাদীস নং(১২৯০); আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

আদায় করতাম এবং লোকদের পৌঁছার পূর্বেই জামরায় পাথর নিক্ষেপ করতাম।”[1]

আর দুর্বল ব্যক্তি যার পক্ষে মানুষের ভিড়ে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা কষ্টকর হয়, তার জন্য অনুমতি রয়েছে যে, সে চাঁদ ডোবার পর ফজরের আগে মিনা থেকে রওনা হয়ে যেতে পারে এবং ভিড়ের আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারে। সহীহ মুসলিমে আসমা (রোদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে: আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা মুযদালিফা অবস্থানকালে চাঁদ অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা করতেন এবং তার আযাদকৃত দাসকে জিজ্ঞাসা করতেন, চাঁদ ডুবেছে কি? যখন সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সাথে রওনা হও। আমরা রওনা হলাম এবং জামরায় (পৌঁছে) তিনি কংকর নিক্ষেপ করলেন, এরপর নিজের তাঁবুতে সালাত আদায় করলেন। আমি তাকে বললাম, হে সম্মানিত মহিলা! আমরা খুব ভোরে রওনা হয়েছিলাম। তিনি বললেন, কোন অসুবিধা নেই হে বৎস! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[1] সহীহ বুখারী: হজ পর্ব, অধ্যায়: যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের রাত্রে পূর্বে প্রেরণ করে মুযদালিফায় অবস্থান করে ও দু‘আ করে এবং পূর্বে প্রেরণ করবে চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার পর, হাদীস নং (১৬৭৯); সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: দুর্বল ব্যক্তি, বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য রাতের শেষাংশে মানুষের ভিড় শুরু হওয়ার আগেই মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে রওনা হওয়া মুস্তাহাব। অন্যদের জন্য মুযদালিফায় অবস্থান করে ফজরের সালাত আদায় করে মিনার দিকে রওনা হওয়া মুস্তাহাব, হাদীস নং(১২৯১); আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীস।

ওয়াসাল্লাম মহিলাদের খুব ভোরে রওনা হওযার অনুমতি দিয়েছিলেন।[1]

আর যে সকল দুর্বল ব্যক্তির জন্য ফজরের আগে মুযদালিফা থেকে রওনা হওয়া জায়েয, তাদের সাথে যারা থাকবে তারাও ফজরের আগে রওনা হতে পারবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারের দুর্বল সদস্যদের সাথে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে রাতের বেলায় মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে পাঠিয়েছিলেন। যদি সে দুর্বলদের অন্তর্ভূক্ত হয় তবে মিনায় পৌঁছেই জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারবে; কেননা তার মানুষের ভিড়ের সামলানোর সক্ষমতা নেই। কিন্তু যদি ভিড় সামলানোর সামর্থ্য থাকে, তবে সূর্যোদয়ের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। দলীল: ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন:

بَعَثَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ عَلَىٰ حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَجَعَلَ يُلَطِّخُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: «أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا ٱلْجَمْرَةَ، حَتَّىٰ تَطْلُعَ ٱلشَّمْسُ».

---

[1] আবূ দাঊদ, হজের কার্যাদি পর্ব, অধ্যায়: মুযদালিফা থেকে দ্রুত প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৯৪০); তিরমিযী, হজ পর্ব, অধ্যায়: দুর্বলদের মুযদালিফা থেকে অগ্রে প্রেরণ প্রসঙ্গ, হাদীস নং (৮৯৩); নাসায়ী, হজের কার্যাদি পর্ব, অধ্যায়: সূর্যোদয়ের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গ, হাদীস নং (৩০৬৪); ইবনে মাজাহ, হজ পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুযদালিফা থেকে কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য আগে আগে মিনায় আসে, হাদীস নং (৩০২৫); সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং (৩৮৬৯) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। হাদীস।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের অল্প বয়স্কদেরকে আমাদের গাধাগুলোয় চড়িয়ে মুযদালিফা থেকে আগেভাগে পাঠিয়ে দেন। তিনি আমাদের উরুর উপর হাল্কা আঘাত করে বলেন: "আমার কচিকাঁচারা! সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত জামরায় পাথর নিক্ষেপ করো না।" প্রসিদ্ধ পাঁচটি কিতাবের গ্রন্থাকারগণ এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান এটিকে সহীহ বলেছেন।[1]

মোদ্দাকথা হল: মুযদালিফা থেকে রওনা হওয়া ও ঈদের দিন জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

প্রথমত: যে ব্যক্তি শক্তিশালী এবং তার সাথে কোনো দুর্বল ব্যক্তি নেই, সে মুযদালিফা থেকে ফজরের সালাত আদায় না করে রওনা হবে না এবং সে সূর্যোদয়ের আগে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে না, কেননা এটিই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল। আর তিনি বলেছেন:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»[81].

---

1 সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঈদের দিনে (নহরের দিন) জামরাতুল 'আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করার সময় সওয়ার হয়ে করা মুস্তাহাব, এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী — «তোমরা তোমাদের হজের নিয়মাবলি আমার কাছ থেকে শিখে নাও» — এর ব্যাখ্যা, হাদীস নং (১২৯৭), জাবির (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস।

"তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়ম গ্রহণ কর।"[1] আর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিকে মুযদালিফা থেকে ফজরের আগে রওনা হতে কিংবা সূর্যোদয়ের আগে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে অনুমতি দেননি।

দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি শক্তিশালী কিন্তু তার সাথে দুর্বল ব্যক্তি রয়েছে, সে ইচ্ছা করলে তাদের সাথে রাতের শেষাংশে মুযদালিফা থেকে রওনা হতে পারবে। মিনায় পৌঁছামাত্রই দুর্বল ব্যক্তি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। কিন্তু শক্তিশালী ব্যক্তি সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ করবে না; কেননা তার কোনো অজুহাত নেই।[2]

তৃতীয়ত: দুর্বল ব্যক্তি, তার জন্য চাঁদ অস্ত যাওয়ার পর রাতের শেষাংশে মুযদালিফা থেকে রওনা হওয়া

---

1 সম্মানিত গ্রন্থকার রহিমাহুল্লাহ তার ফাতাওয়াল হজ (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২ ও পরবর্তী অংশ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

"শক্তিশালী ব্যক্তি, যার সাথে দুর্বল ব্যক্তি রয়েছে, সে তাদের সাথে ফজরের আগেই মুযদালিফা থেকে রওনা হয়ে জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারবে। কেননা অন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হিসেবে এমন কিছু জায়েয হয়ে যায় যা মূলত এককভাবে জায়েয নয়।"

2 আবূ দাঊদ, হজের কার্যাদি পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান পেল না, হাদীস নং (১৯৫০); তিরমিযী, হজ পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুযদালিফায় ইমামকে পাবে সে হজ পেল বলে গণ্য হবে, হাদীস নং (৮৯১); নাসায়ী, হজের কার্যাদি পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুযদালিফায় ইমামের সাথে ফজর সালাত পেল না তার প্রসঙ্গে, হাদীস নং (৩০৪১); ইবনে মাজাহ, হজ পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে আরাফাতে আসে, হাদীস নং (৩০১৬); হাকেম (১/৬৩৪); উরওয়া বিন মুযাররিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস।

এবং মিনায় পৌঁছামাত্র জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয।

যে ব্যক্তি ঈদের রাতে ফজর উদিত হওয়ার পর মুযদালিফায় পৌঁছেছে ও ফজরের সালাত সেখানে আদায় করেছে এবং সে ফজরের আগে আরাফায় অবস্থান করেছে, তার হজ বিশুদ্ধ। উরওয়া বিন মুযাররিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের ভিত্তিতে, এতে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يعني الفجر-، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ».

"আমাদের এই সালাতে- তথা ফজর সালাতে- যে হাযির হয়েছে এবং রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে অবস্থান করেছে আর এর পূর্বে রাতে হোক বা দিনে আরাফায় অবস্থান করেছে। তার হজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সে তার হজের বিধানসমূহ সম্পাদন করে নিতে পেরেছে।" প্রসিদ্ধ পাঁচটি কিতাবের গ্রন্থাকারগণ এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী ও হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন।[1]

এই হাদীসের ব্যহ্যিক অর্থ হল, এরূপ ব্যক্তির উপর দম ওয়াজিব হবে না। কারণ সে মুযদালিফায়

[1] সুনানে আবু দাউদ: হজ পর্ব, অধ্যায়: অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ পালন প্রসঙ্গ, হাদীস নং (১৮১১), এবং সুনানে ইবনে মাজাহ: হজ পর্ব, অধ্যায়: মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ পালন প্রসঙ্গ, হাদীস নং (২৯০৩), ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

অবস্থানের অংশবিশেষ পেয়েছে এবং মাশআরুল হারামে ফজরের সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর যিকির করেছে। ফলে তার হজ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। যদি তার উপর দম ওয়াজিব হতো, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তা বর্ণনা করে দিতেন। -আল্লাহই সর্বজ্ঞ-।

একাদশতম ফায়েদা: কঙ্কর নিক্ষেপ প্রসঙ্গে:

১- কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য ব্যবহৃত পাথর ছোলা ও বাদামের মাঝামাঝি আকারের হবে, খুব বড় বা খুব ছোট হবে না। মিনা, মুযদালিফা বা অন্য কোনো স্থান থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করতে হবে; প্রতিদিনেরটি সেই দিনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করেছেন বা সব দিনের কঙ্কর একত্রিত করেছে মর্মে কোনো বর্ণনা প্রমাণিত নয়। আমার জানামতে, তিনি তার সাহাবীদেরকেও এমন নির্দেশ দেননি।

২- কঙ্কর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে কঙ্করটি জামরার স্তম্ভে সরাসরি আঘাত করা ওয়াজিব নয়, বরং তা কঙ্কর জমা হওয়ার নির্দিষ্ট গর্তে (হাউযে) পতিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যদি কঙ্কর স্তম্ভে আঘাত করে কিন্তু গর্তে না পড়ে, তবে নতুন করে কঙ্কর মারা আবশ্যক হবে। আর যদি কঙ্কর গর্তে পড়ে স্থির হয়, তবে তা যথেষ্ট হবে যদিও তা স্তম্ভকে আঘাত না করে।

৩- যদি কেউ কোনো এক জামরায় একটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে ভুলে যায় এবং শুধু ছয়টি কঙ্কর নিক্ষেপ করে, অতঃপর তার অবস্থান স্থলে আসার পর স্মরণ হয়,

তবে সে ফিরে যাবে এবং ভুলে যাওয়া কঙ্করটি নিক্ষেপ করবে। এতে তার কোনো গুনাহ হবে না। আর যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তার স্মরণ হয়, তবে পরের দিন পর্যন্ত বিলম্ব করবে, পরের দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর প্রথমে সেই ভুলে যাওয়া কঙ্করটি নিক্ষেপ করবে, তারপর সেই দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

দ্বাদশ ফায়েদা: প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ হালাল হওয়া প্রসঙ্গে:

যখন হাজী ঈদের দিন জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করবে, তখন সে প্রাথমিক হালাল হয়ে যাবে। এ অবস্থায় তার জন্য স্ত্রী সহবাস ছাড়া ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়াবলী - যেমন সুগন্ধি ব্যবহার, সাধারণ পোশাক পরিধান, চুল বা নখ কাটা ইত্যাদি - জায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু স্ত্রী সহবাস বা তার দিকে কামভাব নিয়ে তাকানো জায়েয হবে না, যতক্ষণ না সে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী সম্পন্ন করে। যখন সে তাওয়াফ ও সায়ী শেষ করবে তখন দ্বিতীয় হালাল হয়ে যাবে, এবং তার জন্য তখন সব নিষিদ্ধ বিষয়ই জায়েয হয়ে যাবে, এমনকি স্ত্রী সহবাসও।

তবে যতক্ষণ হারাম এলাকার সীমার মধ্যে থাকবে, ততক্ষণ তার জন্য শিকার করা, গাছপালা ও সবুজ তৃণলতা কাটা নিষিদ্ধ থাকবে, কিন্তু এটি ইহরামের কারণে নয় বরং হারাম এলাকার অভ্যন্তরে থাকার কারণে, কেননা ইহরাম থেকে সে হালাল হয়ে গেছে।

ত্রয়োদশ ফায়েদা: কঙ্কর নিক্ষেপে প্রতিনিধি নিযুক্তকরণ প্রসঙ্গে:

যে ব্যক্তি নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে সক্ষম, তার জন্য অন্য কাউকে কঙ্কর নিক্ষেপের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা জায়েয নয়, তার হজ ফরয হোক বা নফল হোক। কেননা নফল হজ কেউ শুরু করলে তা সম্পন্ন করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, যার পক্ষে নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করা কষ্টকর, যেমন রোগী, বৃদ্ধ ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী ইত্যাদি, তাদের জন্য অন্য কাউকে দিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করানো জায়েয; তাদের হজ ফরয হোক বা নফল হোক। হাজী নিজে কঙ্কর সংগ্রহ করে প্রতিনিধিকে দিক, বা প্রতিনিধি নিজেই কঙ্কর সংগ্রহ করুক উভয়টিই জায়েয।

প্রতিনিধি প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, তারপর অন্যের পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ব্যাপক অর্থবোধক বাণীর আলোকে:

«ابْدَأْ بِنَفْسِكَ»[84].

"তুমি নিজেকে দিয়ে শুরু করো।" [৮৪[[1] এবং তার বাণী:

«حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»[85].

[1] সহীহ মুসলিম: যাকাত পর্ব, অধ্যায়: প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করা অতঃপর পরিবারের জন্য, হাদীস নং (৯৯৭)।

“আগে নিজের জন্য হজ করো, তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ করো।”[1]

প্রতিনিধি একই স্থানে দাঁড়িয়ে প্রথমে নিজের জন্য, তারপর মুওয়াক্কিলের (যার পক্ষে কঙ্কর নিক্ষেপ করছে) জন্য কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারবে। কাজেই প্রথম জামরায় প্রথমে ৭টি কঙ্কর নিজের জন্য, অতঃপর ৭টি মুওয়াক্কিলের জন্য নিক্ষেপ করবে। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামরায়ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করবে। যেমনটি জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদিসের বাহ্যিক অর্থ এটাই নির্দেশ করে, যেখানে তিনি বলেছেন: “আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করেছিলাম, তখন আমরা শিশুদের পক্ষ হতে তালবিয়া পাঠ করেছিলাম এবং তাদের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলাম।” মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ।[2] এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা একই স্থানে দাঁড়িয়ে তা করতেন। কারণ যদি তারা প্রথমে নিজেদের পক্ষ থেকে তিনটি জামরার কঙ্কর

---

[1] মুসনাদে আহমাদ, (২২/২৬৯, হাদীস নং ১৪৩৭০), সুনানে ইবনে মাজাহ: হজ পর্ব, অধ্যায়: শিশুদের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ, হাদীস নং (৩০৩৮), জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

[2] সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: মাথা মুণ্ডনের পূর্বে যাবেহ করা, হাদীস নং (১৭২২); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করল বা পাথর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ করল, হাদীস নং(১৭০৩); ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

নিক্ষেপ শেষ করে আবার প্রথম জামরায় ফিরে শিশুদের পক্ষে কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন, তবে তা অবশ্যই বর্ণিত হতো। -আর আল্লাহই অধিক অবগত-।

চতুর্দশ ফায়েদা: ঈদের দিনে হজের কার্যাবলী প্রসঙ্গে:

ঈদের দিনে হজ আদায়কারী নিম্ন বর্ণিত চারটি কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করবেন:

এক: জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ।

দুই: তার উপর হাদী থাকলে হাদী যবেহ করা।

তিন: মাথা মুণ্ডন বা চুল খাটো করা।

চার: বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।

পক্ষান্তরে সায়ীর বিধান হল, যদি সে তামাত্তু হজ আদায়কারী হয়, তবে হজের সায়ী আদায় করবে। আর যদি কিরান বা ইফরাদ হজ আদায়কারী হয় এবং যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সায়ী করে থাকে, তবে সেই সায়ীই যথেষ্ট হবে। আর যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সায়ী না করে থাকে তবে এখন (অর্থাৎ হজের তাওয়াফের পর) সায়ী করবে।

এই কাজগুলো উক্ত ধারাবাহিকতায় আদায় করা শরীয়তসিদ্ধ। তবে যদি কেউ কোন কাজ আগে-পিছে করে ফেলে, যেমন কঙ্কর নিক্ষেপের আগে কুরবানী করা, কুরবানীর আগে মাথা মুণ্ডন করা বা মাথা মুণ্ডনের আগে তাওয়াফ করা, তাহলে যদি সে অজ্ঞতাবশত বা ভুলবশত এমনটি করে থাকে তবে তার উপর কোনো গুনাহ নেই। আর যদি কেউ জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে

করে, তাহলে ইমাম আহমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তারও কোন গুনাহ নেই। কেননা সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথা মুণ্ডনের পূর্বে কুরবানী করা বা অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন:

«لَا حَرَجَ»[87].

"কোন সমস্যা নেই।"[1]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ: «لَا حَرَجَ». فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: «ٱذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ. قَالَ: «لَا حَرَجَ»[88].

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিনাতে কুরবানীর দিন জিজ্ঞাসা করা হত, তখন তিনি বলতেন: কোন সমস্যা নেই। তাকে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যবেহ (কুরবানী) করার আগেই মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন: যবেহ করে নাও, এতে কোন দোষ নেই। সাহাবী আরো বললেন, আমি সন্ধ্যার

---

[1] সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কেউ যদি সন্ধ্যার পর কংকর মারে অথবা কুরবানী করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলে, হাদীস নং (১৭৩৫); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করল বা পাথর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ করল, হাদীস নং(১৭০৩); ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

পর কংকর মেরেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কোন সমস্যা নেই।”[1]

তার থেকে আরো বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরবানী, মাথা মুণ্ডন, পাথর নিক্ষেপ আগে বা পরে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন:

«لَا حَرَجَ»[89].

“কোন সমস্যা নেই।”[2]

وَسُئِلَ عَمَّنْ زَارَ -أَيْ: طَافَ طَوَافَ ٱلزِّيَارَةِ- قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»

তাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে 'যিয়ারতের তাওয়াফ' (অর্থাৎ হজের ফরয তাওয়াফ) পাথর নিক্ষেপের আগে করে ফেলেছে, অথবা পাথর

---

1 সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: কেউ যদি সন্ধ্যার পর কংকর মারে অথবা কুরবানী করার আগে মাথা কামিয়ে ফেলে, হাদীস নং (১৭৩৪); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করল বা পাথর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ করল, হাদীস নং(১৭০৩); ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

2 সহীহ বুখারী: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: মাথা মুণ্ডনের পূর্বে যাবেহ করা, হাদীস নং (১৭২২); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করল বা পাথর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ করল, হাদীস নং(১৭০৩); ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

নিক্ষেপের আগে কুরবানী করে ফেলেছে। তিনি উত্তরে বললেন: "কোনো সমস্যা নেই।" সহীহ বুখারী।[1]

আব্দুল্লাহ বিন আমরের হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেদিন আগে বা পরে করা যে কাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল, তিনি এ কথাই বলছিলেন:

«ٱفْعَلْ وَلَا حَرَجَ»[91].

"কর, কোন সমস্যা নেই।"[2]

যদি কেউ কুরবানী করাকে মক্কায় যাওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে তা 'আইয়ামে তাশরীক' (১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ) পর পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। আর যদি কেউ তাওয়াফ বা সায়ী ঈদের দিন থেকে পিছিয়ে দেয়, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কোনো অজুহাত ছাড়া যিলহজ মাস থেকে পিছিয়ে দিবে না। যেমন: কোনো মহিলার তাওয়াফের আগে নিফাস (প্রসব-পরবর্তী রক্তস্রাব)

---

1 সহীহ বুখারী: ইলম সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া, হাদীস নং (৮৩); এবং সহীহ মুসলিম: হজ সংক্রান্ত পর্ব, অধ্যায়: যে ব্যক্তি কুরবানীর পূর্বে মাথা মুণ্ডন করল বা পাথর নিক্ষেপের পূর্বে যবেহ করল, হাদীস নং(১৩০৬); ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

2 সহীহ মুসলিম: হজ বিষয়ক পর্ব, অধ্যায়: ঈদের দিনে (নহরের দিন) জামরাতুল 'আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করার সময় সওয়ার হয়ে করা মুস্তাহাব, এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী — «তোমরা তোমাদের হজের নিয়মাবলি আমার কাছ থেকে শিখে নাও» — এর ব্যাখ্যা, হাদীস নং (১২৯৭), জাবির (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস।

শুরু হলে, সে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ পিছিয়ে দিতে পারবে। এমনকি যিলহজ মাস পার হয়ে গেলেও কোনো সমস্যা নেই এবং কোনো ফিদিয়া দিতে হবে না।

পঞ্চদশ ফায়েদা: কঙ্কর নিক্ষেপের সময় এবং জামারাগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা প্রসঙ্গে:

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, সক্ষম ব্যক্তির জন্য ঈদের দিন পাথর নিক্ষেপের সময় সূর্যোদয়ের পর থেকে। আর যাদের জন্য মানুষের ভিড়ে যাওয়া কষ্টকর, তারা ঈদের রাতের শেষাংশ (অর্থাৎ শেষ রাত) থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারে। আর তাশরীকের দিনগুলোতে পাথর নিক্ষেপের সময় সূর্য ঢলে পড়ার (যোহর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার) পর থেকে। তাই যোহরের আগে পাথর নিক্ষেপ করা যাবে না, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীকের দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করেননি, আর তিনি বলেছেন:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»[92].

"তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়ম গ্রহণ কর।"[1]

ঈদের দিন ও তার পরের দিনগুলোতে পাথর নিক্ষেপের সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, তাই

---

[1] সম্মানিত শাইখ ও গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) তার ফাতাওয়াল হজ গ্রন্থে বলেন: "হাজীর জন্য দিনে পাথর নিক্ষেপ করা উত্তম। তবে যদি ভিড়ের আশঙ্কা থাকে, তাহলে রাতে নিক্ষেপ করতেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর নিক্ষেপের শুরুর সময় নির্ধারণ করলেও শেষের সময় সীমাবদ্ধ করেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে এ বিষয়টিতে প্রশস্ততা রয়েছে।

রাতে পাথর নিক্ষেপ করা যাবে না। কিছু আলেমের মতে, যে দিনে পাথর নিক্ষেপ করতে পারবে না, সে রাতে পাথর নিক্ষেপ করতে পারে, তবে ১৪ তারিখের রাতে করা যাবে না; কেননা মিনার দিনসমূহ ১৩ তারিখ সূর্যাস্তের সাথে শেষ হয়ে যায়। তবে প্রথম মতটি বেশি সতর্কতামূলক। কাজেই যদি কেউ কোনো দিনের পাথর নিক্ষেপ করতে না পারে, তবে পরের দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর প্রথমে আগের দিনের পাথর নিক্ষেপ করবে, তারপর বর্তমান দিনের পাথর নিক্ষেপ সম্পন্ন করবে।[1]

তিনটি জামরার মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। তাই প্রথমে মসজিদে খাইফের নিকটবর্তী প্রথম জামরা, তারপর মধ্যম জামরা, এবং সবশেষে জামরায়ে আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। সুতরাং যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং জেনে-বুঝে জামরায়ে আকাবা বা মধ্যম জামরা দিয়ে শুরু করে, তবে তাকে অবশ্যই পুনরায় নিক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু যদি

---

[1] সম্মানিত শাইখ ও গ্রন্থকার (রেহিমাহুল্লাহ) তার ফাতাওয়াল হজ গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৬ ও পরবর্তী অংশে) বলেছেন: "এ বিধান প্রযোজ্য যখন মিনায় স্থান পাওয়া যায়। কিন্তু যদি কেউ মিনায় স্থান না পায়, তাহলে মিনার সীমানার বাইরে যেকোনো দিকে রাত্রী যাপন করলে তার কোনো গুনাহ হবে না , তবে শর্ত হলো তার থাকার স্থান হাজীদের বাসস্থানের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে, যাতে তারা একত্রিত এক উম্মাহর মতো থাকেন। যেমনভাবে আমরা বলে থাকি, যদি মসজিদ ভরে যায়, তাহলে তারা মসজিদের বাইরে সারিবদ্ধভাবে সংযুক্ত হয়ে সালাত আদায় করতে পারেন এবং এতে তাদের কোনো গুনাহ হবে না।"

অজ্ঞতাবশত বা ভুলে এমন করে, তবে তার নিক্ষেপ যথেষ্ট হবে এবং তার উপর কোনো কিছু বর্তাবে না।

ষোড়শ ফায়েদা: মিনায় রাত্রী যাপন প্রসঙ্গে:

মিনায় ১১ ও ১২ তারিখ রাত্রী যাপন করা ওয়াজিব। এই ওয়াজিব হলো রাতের অধিকাংশ সময় মিনায় অবস্থান করা- রাতের শুরুতে হোক বা শেষে হোক। কাজেই যদি কেউ রাতের প্রথম ভাগে মক্কায় চলে যায়, অতঃপর মধ্যরাতের আগে ফিরে আসে অথবা মধ্যরাতের পর মিনা থেকে মক্কায় যায়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই; কেননা সে ওয়াজিব আদায় করেছে।

হাজীকে অবশ্যই মিনার সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে, যাতে সীমানার বাইরে রাত্রী যাপন না করে। মিনার পূর্বদিকের সীমা হলো মুহাসসির উপত্যকা, আর পশ্চিম দিকের সীমা হলো জামরাতুল আকাবা। উপত্যকা ও জামরা মিনার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে মিনাকে ঘিরে থাকা পাহাড়গুলোর মিনার দিকের অংশ মিনার সীমানাভুক্ত, তাই সেখানে রাত কাটানো জায়েয। আর হাজীর মুহাসসির উপত্যকায় বা জামরাতুল আকাবার অপর পাশে রাত কাটানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত, কেননা তা মিনার সীমানার বাইরে। কেউ সেখানে রাত্রী যাপন করলে তা তার মিনায় রাত কাটানো হিসেবে গণ্য হবে না।

সপ্তদশ ফায়েদা: বিদায়ী তাওয়াফ প্রসঙ্গে:

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদায়ী তাওয়াফ (তাওয়াফুল ওয়াদা) মক্কা থেকে বের হওয়ার সময়

প্রত্যেক হাজী ও উমরা পালনকারীর উপর ওয়াজিব। তবে হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত নারীদের জন্য এটি আবশ্যক নয়। কিন্তু যদি তারা মক্কার সীমানা পার হওয়ার আগে পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তাদের জন্য তা আবশ্যক হবে। আর যদি কেউ বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করে মক্কা থেকে বের হয়ে যায়, তারপর একদিন বা তার বেশি সময় অবস্থান করে, তাহলে তার পুনরায় তাওয়াফ করা আবশ্যক হবে না; যদিও তার অবস্থান মক্কার কাছাকাছি কোনো স্থানে হয়।

আর আল্লাহই অধিক অবগত। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর, তার পরিবার ও তার সকল সাহাবীর ওপর সালাত ও সালাম নাযিল করুন।

গ্রন্থকার মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন-এর কলমে কিতাবটি রচনা সম্পন্ন হয়েছে ৭ শাবান ১৩৮৭ হিজরীতে।

আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার অনুগ্রহে সকল ভালো কাজ সম্পন্ন হয়।

গ্রন্থটির সম্পাদনা সমাপ্ত হয়েছে

১৩ রমজান ১৩৮৭ হিজরী, বৃহস্পতিবার সকালে।

আর আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার ও সকল সাহাবীর উপর রহমত বর্ষণ করুন।

সূচিপত্র

উমরাহ ও হজে গমনিচ্ছুকদের পথনির্দেশিকা 2
সফরের আদবসমূহ 5
নারীর সফর 8
মুসাফিরের সালাত 12
মীকাতসমূহ 16
হজের প্রকারভেদ 20
যে ধরনের হজ সম্পাদনকারীর জন্য হাদী আবশ্যক 23
উমরার পদ্ধতি 28
হজের পদ্ধতি 41

bn124v2.0 - 04/09/2026